শতাব্দীর সেরা কবিতা

শতাব্দীর সেরা কবিতা

সম্পাদনায়
রোকেয়া বেগম রুকু

শতাব্দীর সেরা কবিতা
সম্পাদনায়
রোকেয়া বেগম রুকু
প্রকাশকাল : বইমেলা-২০২৩
প্রকাশনায়: ছায়ানীড়, থানাপাড়া, টাঙ্গাইল
০১৭০৬-১৬২৩৭১, ০১৭০৬-১৬২৩৭২
গ্রন্থস্বত্ব : ছায়ানীড়
বর্ণ বিন্যাস : ছায়ানীড় কম্পিউটার বিভাগ
প্রচ্ছদ: তারুণ্য তাওহীদ
মুদ্রণ ও বাঁধাই : দি গুডলাক প্রিন্টার্স
১৩ নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০
শুভেচ্ছা মূল্য : ৩০০
আইএসবিএন:
ISBN:

Shotabdir Sera Kobita By Rokeya Begum Ruku, Published by Chayyanir.Shantikunja More, BSCIC Road, Thanapara, Tangail, 1900. Date of Publication: Ekushey Boimela-2023, Copy Right: writer, Cover design: Tarunnya Tauhid
& Book Setup: Chayyanir Computer, Price: 300

ঘরে বসে যে কোনো বই কিনতে ভিজিট করুন–http://rokomari.com/
ফোনে অর্ডার : ০১৬১১৯১৩২১৪

উৎসর্গ

আকাশ আমার ঘরের ছাউনী
পৃথিবী আমার ঘর
সারা দুনিয়ার সকল মানুষ
কেউ নয় মোর পর॥

- এই অমর কবিতার কবি
সাবির আহমেদ চৌধুরী'র করকমলে

সম্পাদকের সরল কথা

কবিতা মুক্তির কথা বলে। কবিতা সত্য ও সুন্দরের কথা বলে। মানুষের স্বপ্ন ও সংগ্রামের কথা কবিতায় ধ্বনিত হয়। সহস্র বছরের আনন্দ বেদনার কথা কবিতায় বাঙময় হয়ে ওঠে। কবিতা অনিন্দ্য সুন্দরের কথা বলে। কবিতা সকল আঁধারকে দূর করে নতুন ভোরের কথা বলে। কবিতায় চলার ছন্দ থাকে। কবিতায় থাকে নান্দনিক সৌন্দর্যের অলংকার। কবিতায় জাতিসত্তার ইতিহাস থাকে। তখন সে কবিতা হয়ে ওঠে শাশ্বত। সে কবিতা আমাদের যাপিত জীবনে অপরিহার্য হয়ে ওঠে। শতাব্দীর সেই বাছাই করা কবিতা নিয়েই আমার গ্রন্থ সম্পাদনা। এই কবিতায় আছে আমাদের বায়ান্ন এর ভাষা আন্দোলনের কথা, একাত্তরের মুক্তিসংগ্রামের কথা। এই কবিতায় আছে বাঙালি জাতির স্বপ্ন ও সম্ভাবনার কথা। আমাদের যাপিত জীবনের সংকট কাটিয়ে অনন্ত সম্ভাবনার বারতা নিয়ে আসে কবিতা। জীবনকে আনন্দ মুখর করার জন্যে, জীবনকে প্রেমময় করার জন্যে, জীবনকে ঈশ্বরময় করার জন্যে, এক কথায় ধুলোর ধরণীকে স্বর্গে পরিণত করার জন্যে কবিতা আমাদের নিত্য সঙ্গী। শাশ্বত সত্য ও সুন্দরের জন্যে কবিতার বাগানে যারা ফুল ফুটিয়েছেন সেই সেরা ফুলগুলোকে নিয়েই আমি যে পুষ্পমাল্য সম্পাদন করেছি তার নাম 'শতাব্দীর সেরা কবিতা।' এই গ্রন্থটি পাঠকপ্রিয়তা পেলে আমার শ্রম সার্থক হবে। গ্রন্থটির অলংকরণ, শব্দ সংশোধন এক কথায় নান্দনিক সৌন্দর্য বর্ধনে ছায়ানীড়ের অবদান কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি।

রোকেয়া বেগম রুকু

সূচি

১. বিদ্রোহী
২. সোনার তরী
৩. প্রার্থনা
৪. কবর
৫. ষোল আনাই মিছে
তাহারেই পড়ে মনে
স্বাধীনতা তুমি
জোনাকিরা
দূরের পাল্লা
কপোতাক্ষ নদ
পাঞ্জেরি
আমার পরিচয়
মুক্তিসেনা
বনলতা সেন
আযান
ছাড়পত্র
মজার দেশ
তখন সত্যি মানুষ ছিলাম
নোলক
কোথায় রাখিব আজ এ সুখের ভার,
চিঠি দিও
কেউ কথা রাখেনি
পাছে লোকে কিছু বলে
পারিব না
আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি
আর যদি নাই আসো
বাতাসে লাশের গন্ধ
সফদার ডাক্তার
আমাদের গ্রাম
আদর্শ ছেলে
ফুল ফুটুক না ফুটুক
স্বাধীনতা, এই শব্দটি কিভাবে আমাদের হলো
স্বাধীনতার ডাক
কাজলা দিদি
মাতৃভাষা
সবার আমি ছাত্র
আমার পণ
স্বর্গ ও নরক
খুকু ও খোকা
ধন ধান্য পুষ্প ভরা
ভাত দে হারামজাদা
তালেব মাস্টার
মনে থাকবে?
একবার তুমি
জলহাওয়ার লেখা
নিষিদ্ধ সম্পাদকীয়
তুই কি আমার দুঃখ হবি
ভালোবাসার কবিতা লিখবো না
ছবি
রাষ্ট্রপ্রধান কি মেনে নেবেন?
বাঙলা ভাষা
স্বার্থপরতা
গৃহত্যাগী জোৎস্না
ভালোবাসা
রাজার উপর রাজা
ঘাতক তুমি সরে দাঁড়াও
মানুষের সঙ্গে কোনো বিরোধ নেই
বাংলা ছাড়ো
একবার পরাজিত হলে
এক জন্ম
আমাকে তুমি দাঁড় করিয়ে দিয়েছ বিপ্লবের সামনে
আমার বন্ধু নিরঞ্জন
শাড়ি

একুশে ফেব্রুয়ারি
আমি কাঁদতে আসিনি, ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি
নবীর শিক্ষা
আকাশ আমার ঘরের ছাউনী
মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে

বঙ্গভাষা

বিদ্রোহী

কাজী নজরুল ইসলাম

বল বীর
বল উন্নত মম শির!
শির নেহারি আমারি, নত-শির ওই শিখর হিমাদ্রির!
বল বীর-
বল মহাবিশ্বের মহাকাশ ফাড়ি
চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা ছাড়ি
ভূলোক দ্যুলোক গোলক ভেদিয়া
খোদার আসন ‘আরশ’ ছেদিয়া
উঠিয়াছি চির-বিস্ময় আমি বিশ্ব-বিধাতৃর!
মম ললাটে রুদ্র ভগবান জ্বলে রাজ-রাজটীকা দীপ্ত জয়শ্রীর!
বল বীর-
আমি চির উন্নত শির!
আমি চিরদূর্দম, দুর্বিনীত, নৃশংস,
মহা- প্রলয়ের আমি নটরাজ, আমি সাইক্লোন, আমি ধ্বংস!
আমি মহাভয়, আমি অভিশাপ পৃথ্বীর!
আমি দুর্বার,
আমি ভেঙে করি সব চুরমার!
আমি অনিয়ম উচ্ছৃঙ্খল
আমি দ’লে যাই যত বন্ধন, যত নিয়ম কানুন শৃঙ্খল!
আমি মানি না কো কোন আইন,
আমি ভরা-তরী করি ভরা-ডুবি, আমি টর্পেডো, আমি ভীম ভাসমান মাইন!
আমি ধূর্জটি, আমি এলোকেশে ঝড় অকাল-বৈশাখীর
আমি বিদ্রোহী, আমি বিদ্রোহী-সুত বিশ্ব-বিধাতৃর!
বল বীর-
চির-উন্নত মম শির!

আমি ঝঞ্ঝা, আমি ঘূর্ণি,
আমি পথ-সম্মুখে যাহা পাই যাই চূর্ণি।
আমি নৃত্য-পাগল ছন্দ,
আমি আপনার তালে নেচে যাই, আমি মুক্ত জীবনানন্দ।
আমি হাম্বীর, আমি ছায়ানট, আমি হিন্দোল,
আমি চল-চঞ্চল, ঠমকি' ছমকি'
পথে যেতে যেতে চকিতে চমকি'
ফিং দিয়া দিই তিন দোল!
আমি চপলা-চপল হিন্দোল।
আমি তাই করি ভাই যখন চাহে এ মন যা,
করি শত্রুর সাথে গলাগলি, ধরি মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা,
আমি উন্মাদ, আমি ঝঞ্ঝা!
আমি মহামারী আমি ভীতি এ ধরিত্রীর;
আমি শাসন-ত্রাসন, সংহার আমি উষ্ণ চির-অধীর!
বল বীর-
আমি চির-উন্নত শির!
আমি চির-দুরন্ত দুর্মদ,
আমি দুর্দম, মম প্রাণের পেয়ালা হর্দম্ হ্যায় হর্দম্
ঋর্পুর্ মদ।
আমি হোম-শিখা, আমি সাগ্নিক জমদগ্নি,
আমি যজ্ঞ, আমি পুরোহিত, আমি অগ্নি।
আমি সৃষ্টি, আমি ধ্বংস, আমি লোকালয়, আমি শ্মশান,
আমি অবসান, নিশাবসান!
আমি ইন্দ্রানী-সুত হাতে চাঁদ ভালে সূর্য
মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী আর হাতে রণ-তূর্য;
আমি কৃষ্ণ-কণ্ঠ, মন্থন-বিষ পিয়া ব্যথা-বারিধীর।
আমি ব্যোমকেশ, ধরি বন্ধন-হারা ধারা গঙ্গোত্রীর।
বল বীর-
চির- উন্নত মম শির!
আমি সন্ন্যাসী, সুর-সৈনিক,
আমি যুবরাজ, মম রাজবেশ ম্লান গৈরিক।

আমি বেদুঈন, আমি চেঙ্গিস,
আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্ণিশ!
আমি বজ্র, আমি ঈশান-বিষাণে ওঙ্কার,
আমি ইস্রাফিলের শিঙ্গার মহা হুঙ্কার,
আমি পিণাক-পাণির ডমরু ত্রিশূল, ধর্মরাজের দন্ড,
আমি চক্র ও মহা শঙ্খ, আমি প্রণব-নাদ প্রচন্ড!
আমি ক্ষ্যাপা দুর্বাসা, বিশ্বামিত্র-শিষ্য,
আমি দাবানল-দাহ, দাহন করিব বিশ্ব।
আমি প্রাণ খোলা হাসি উল্লাস, -আমি সৃষ্টি-বৈরী মহাত্রাস,
আমি মহা প্রলয়ের দ্বাদশ রবির রাহু গ্রাস!
আমি কভূ প্রশান্ত কভূ অশান্ত দারুণ স্বেচ্ছাচারী,
আমি অরুণ খুনের তরুণ, আমি বিধির দর্পহারী!
আমি প্রভোন্জনের উচ্ছ্বাস, আমি বারিধির মহা কল্লোল,
আমি উজ্জ্বল, আমি প্রোজ্জ্বল,
আমি উচ্ছ্বল জল-ছল-ছল, চল-উর্মির হিন্দোল-দোল!
আমি বন্ধন-হারা কুমারীর বেণু, তন্বী-নয়নে বহ্নি
আমি ষোড়শীর হৃদি-সরসিজ প্রেম উদ্দাম, আমি ধন্যি!
আমি উন্মন মন উদাসীর,
আমি বিধবার বুকে ক্রন্দন-শ্বাস, হা হুতাশ আমি
হুতাশীর।
আমি বঞ্চিত ব্যথা পথবাসী চির গৃহহারা যত
পথিকের,
আমি অবমানিতের মরম বেদনা, বিষ-জ্বালা, প্রিয়
লাঞ্চিত বুকে গতি ফের
আমি অভিমানী চির ক্ষুব্ধ হিয়ার কাতরতা, ব্যথা সুনিবিড়
চিত চুম্বন-চোর কম্পন আমি থর-থর-থর প্রথম প্রকাশ কুমারীর!
আমি গোপন-প্রিয়ার চকিত চাহনি, ছল-করে দেখা অনুখন,
আমি চপল মেয়ের ভালোবাসা, তা'র কাঁকন-চুড়ির কন-কন!
আমি চির-শিশু, চির-কিশোর,
আমি যৌবন-ভীতু পল্লীবালার আঁচড় কাঁচলি নিচোর!
আমি উত্তর-বায়ু মলয়-অনিল উদাস পূরবী হাওয়া,

আমি পথিক-কবির গভীর রাগিণী, বেণু-বীণে গান গাওয়া।
আমি আকুল নিদাঘ-তিয়াসা, আমি রৌদ্র-রুদ্র রবি
আমি মরু-নির্ঝর ঝর ঝর, আমি শ্যামলিমা ছায়া-ছবি!
আমি তুরীয়ানন্দে ছুটে চলি, এ কি উন্মাদ আমি উন্মাদ!
আমি সহসা আমারে চিনেছি, আমার খুলিয়া গিয়াছে সব বাঁধ!
আমি উত্থান, আমি পতন, আমি অচেতন-চিতে চেতন,
আমি বিশ্ব-তোরণে বৈজয়ন্তী, মানব-বিজয়-কেতন।
ছুটি ঝড়ের মতন করতালি দিয়া
স্বর্গ মর্ত্য-করতলে,
তাজী বোররাক আর উচ্চৈঃশ্রবা বাহন আমার
হিম্মত- হ্রেষা হেঁকে চলে!
আমি বসুধা-বক্ষে আগ্নিয়াদ্রি, বাড়ব-বহ্নি, কালানল,
আমি পাতালে মাতাল অগ্নি-পাথার-কলরোল-কল-কোলাহল!
আমি তড়িতে চড়িয়া উড়ে চলি জোর তুড়ি দিয়া দিয়া লম্ফ,
আমি ত্রাস সঞ্চারি ভুবনে সহসা সন্‌চারি ভূমিকম্প।
ধরি বাসুকির ফণা জাপটি’-
ধরি স্বর্গীয় দূত জিব্রাইলের আগুনের পাখা সাপটি’।
আমি দেব শিশু, আমি চন্‌চল,
আমি ধৃষ্ট, আমি দাঁত দিয়া ছিঁড়ি বিশ্ব মায়ের অঞ্চল!
আমি অর্ফিয়াসের বাঁশরী,
মহা- সিন্ধু উতলা ঘুমঘুম
ঘুম চুমু দিয়ে করি নিখিল বিশ্বে নিঝঝুম
মম বাঁশরীর তানে পাশরি
আমি শ্যামের হাতের বাঁশরী।
আমি রুষে উঠি যবে ছুটি মহাকাশ ছাপিয়া,
ভয়ে সপ্ত নরক হাবিয়া দোজখ নিভে নিভে যায় কাঁপিয়া!
আমি বিদ্রোহ-বাহী নিখিল অখিল ব্যাপিয়া!
আমি শ্রাবণ-প্লাবন-বন্যা,
কভু ধরনীরে করি বরণীয়া, কভু বিপুল ধ্বংস-ধন্যা-
আমি ছিনিয়া আনিব বিষ্ণু-বক্ষ হইতে যুগল কন্যা!
আমি অন্যায়, আমি উল্কা, আমি শনি,
আমি ধূমকেতু-জ্বালা, বিষধর কাল-ফণী!
আমি ছিন্নমস্তা চন্ডী, আমি রণদা সর্বনাশী,
আমি জাহান্নামের আগুনে বসিয়া হাসি পুষ্পের হাসি!
আমি মৃন্ময়, আমি চিন্ময়,
আমি অজর অমর অক্ষয়, আমি অব্যয়।
আমি মানব দানব দেবতার ভয়,
বিশ্বের আমি চির-দুর্জয়,
জগদীশ্বর-ঈশ্বর আমি পুরুষোত্তম সত্য,
আমি তাথিয়া তাথিয়া মাথিয়া ফিরি স্বর্গ-পাতাল মর্ত্য!
আমি উন্মাদ, আমি উন্মাদ!!
আমি চিনেছি আমারে, আজিকে আমার খুলিয়া
গিয়াছে সব বাঁধ!!
আমি পরশুরামের কঠোর কুঠার
নিঃক্ষত্রিয় করিব বিশ্ব, আনিব শান্তি শান্ত উদার!
আমি হল বলরাম-স্কন্ধে
আমি উপাড়ি’ ফেলিব অধীন বিশ্ব অবহেলে নব সৃষ্টির মহানন্দে।
মহা-বিদ্রোহী রণ ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত,
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে
রণিবে না-
বিদ্রোহী রণ ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত।
আমি বিদ্রোহী ভৃগু, ভগবান বুকে এঁকে দিই পদ-চিহ্ন,
আমি স্রষ্টা-সূদন, শোক-তাপ হানা খেয়ালী বিধির বক্ষ করিব ভিন্ন!
আমি বিদ্রোহী ভৃগু, ভগবান বুকে এঁকে দেবো পদ-চিহ্ন!
আমি খেয়ালী-বিধির বক্ষ করিব ভিন্ন!

আমি চির-বিদ্রোহী বীর-
বিশ্ব ছাড়ায়ে উঠিয়াছি একা চির-উন্নত শির!

সোনার তরী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা।
কূলে একা বসে আছি, নাহি ভরসা।
রাশি রাশি ভারা ভারা
ধান কাটা হল সারা,
ভরা নদী ক্ষুরধারা
খরপরশা।
কাটিতে কাটিতে ধান এল বরষা।

একখানি ছোটো খেত, আমি একেলা,
চারি দিকে বাঁকা জল করিছে খেলা।
পরপারে দেখি আঁকা
তরুছায়ামসীমাখা
গ্রামখানি মেঘে ঢাকা
প্রভাতবেলা-
এ পারেতে ছোটো খেত, আমি একেলা।

গান গেয়ে তরী বেয়ে কে আসে পারে,
কে যেন মনে হয় চিনি উহারে।
ভরা-পালে চলে যায়,
কোনো দিকে নাহি চায়,
ঢেউগুলি নিরুপায়
ভাঙে দু-ধারে--
দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে।

ওগো, তুমি কোথা যাও কোন বিদেশে,
বারেক ভিড়াও তরী কূলেতে এসে।
যেয়ো যেথা যেতে চাও,
যারে খুশি তারে দাও,
শুধু তুমি নিয়ে যাও
ক্ষণিক হেসে
আমার সোনার ধান কূলেতে এসে।

যত চাও তত লও তরণী-পরে।
আর আছে?- আর নাই, দিয়েছি ভরে।
এতকাল নদীকূলে
যাহা লয়ে ছিনু ভুলে
সকলি দিলাম তুলে
থরে বিথরে--
এখন আমারে লহ করুণা করে।

ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই- ছোটো সে তরী
আমারি সোনার ধানে গিয়েছে ভরি।
শ্রাবণ গগন ঘিরে
ঘন মেঘ ঘুরে ফিরে,
শূন্য নদীর তীরে
রহিনু পড়ি-
যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী।

প্রার্থনা

গোলাম মোস্তফা

অনন্ত অসীম প্রেমময় তুমি
বিচার দিনের স্বামী।
যত গুণগান হে চির মহান
তোমারি অন্তর্যামী।

দ্যুলোক-ভূলোক সবারে ছাড়িয়া
তোমারি চরণে পড়ি লুটাইয়া
তোমারি সকাশে যাচি হে শকতি
তোমারি করুণাকামী।

সরল সঠিক পূণ্য পন্থা
মোদের দাও গো বলি,
চালাও সে-পথে যে-পথে তোমার
প্রিয়জন গেছে চলি।

যে-পথে তোমার চির-অভিশাপ
যে-পথে ভ্রান্তি, চির-পরিতাপ
হে মহাচালক, মোদের কখনও
করো না সে পথগামী।

কবর

জসীমউদ্দীন

এই খানে তোর দাদির কবর ডালিম-গাছের তলে,
তিরিশ বছর ভিজায়ে রেখেছি দুই নয়নের জলে।
এতটুকু তারে ঘরে এনেছিনু সোনার মতন মুখ,
পুতুলের বিয়ে ভেঙে গেল বলে কেঁদে ভাসাইত বুক।
এখানে ওখানে ঘুরিয়া ফিরিতে ভেবে হইতাম সারা,
সারা বাড়ি ভরি এত সোনা মোর ছড়াইয়া দিল কারা!
সোনালি ঊষার সোনামুখ তার আমার নয়নে ভরি
লাঙল লইয়া খেতে ছুটিলাম গাঁয়ের ও-পথ ধরি।
যাইবার কালে ফিরে ফিরে তারে দেখে লইতাম কত
এ কথা লইয়া ভাবি-সাব মোরে তামাশা করিত শত।
এমনি করিয়া জানি না কখন জীবনের সাথে মিশে
ছোট-খাট তার হাসি ব্যথা মাঝে হারা হয়ে গেনু দিশে।

বাপের বাড়িতে যাইবার কালে কহিত ধরিয়া পা
আমারে দেখিতে যাইও কিন্তু উজান-তলীর গাঁ।
শাপলার হাটে তরমুজ বেচি পয়সা করি দেড়ী,
পুঁতির মালার একছড়া নিতে কখনও হত না দেরি।
দেড় পয়সার তামাক এবং মাজন লইয়া গাঁটে,
সন্ধ্যাবেলায় ছুটে যাইতাম শ্বশুরবাড়ির বাটে!
হেস না হেস না শোন দাদু, সেই তামাক মাজন পেয়ে,
দাদি যে তোমার কত খুশি হত দেখিতিস যদি চেয়ে!
নথ নেড়ে নেড়ে কহিত হাসিয়া, এতদিন পরে এলে,
পথ পানে চেয়ে আমি যে হেথায় কেঁদে মরি আঁখিজলে।
আমারে ছাড়িয়া এত ব্যথা যার কেমন করিয়া হায়,
কবর দেশেতে ঘুমায়ে রয়েছে নিঝঝুম নিরালায়!
হাত জোড় করে দোয়া মাঙ দাদু, আয় খোদা! দয়াময়,
আমার দাদীর তরেতে যেন গো ভেস্ত নসিব হয়।

তারপর এই শূন্য জীবনে যত কাটিয়াছি পাড়ি
যেখানে যাহারে জড়ায়ে ধরেছি সেই চলে গেছে ছাড়ি।
শত কাফনের, শত কবরের অঙ্ক হৃদয়ে আঁকি,
গণিয়া গণিয়া ভুল করে গণি সারা দিনরাত জাগি।
এই মোর হাতে কোদাল ধরিয়া কঠিন মাটির তলে,
গাড়িয়া দিয়াছি কত সোনামুখ নাওয়ায়ে চোখের জলে।
মাটিরে আমি যে বড় ভালবাসি, মাটিতে মিশায়ে বুক,
আয়-আয় দাদু, গলাগলি ধরি কেঁদে যদি হয় সুখ।

এইখানে তোর বাপজি ঘুমায়, এইখানে তোর মা,
কাঁদছিস তুই? কী করিব দাদু! পরাণ যে মানে না।
সেই ফালগুনে বাপ তোর এসে কহিল আমারে ডাকি,
বা-জান, আমার শরীর আজিকে কী যে করে থাকি থাকি।
ঘরের মেঝেতে সপটি বিছায়ে কহিলাম বাছা শোও,
সেই শোওয়া তার শেষ শোওয়া হবে তাহা কী জানিত কেউ?
গোরের কাফনে সাজায়ে তাহারে চলিলাম যবে বয়ে,
তুমি যে কহিলা বা-জানরে মোর কোথা যাও দাদু লয়ে?
তোমার কথার উত্তর দিতে কথা থেমে গেল মুখে,
সারা দুনিয়ার যত ভাষা আছে কেঁদে ফিরে গেল দুখে!

তোমার বাপের লাঙল-জোয়াল দুহাতে জড়ায়ে ধরি,
তোমার মায়ে যে কতই কাঁদিতে সারা দিনমান ভরি।
গাছের পাতার সেই বেদনায় বুনো পথে যেতো ঝরে,
ফালগুনী হাওয়া কাঁদিয়া উঠিত শুনো-মাঠখানি ভরে।
পথ দিয়া যেতে গেঁয়ো পথিকেরা মুছিয়া যাইত চোখ,
চরণে তাদের কাঁদিয়া উঠিত গাছের পাতার শোক।
আথালে দুইটি জোয়ান বলদ সারা মাঠ পানে চাহি,
হাম্বা রবেতে বুক ফাটাইত নয়নের জলে নাহি।
গলাটি তাদের জড়ায়ে ধরিয়া কাঁদিত তোমার মা,
চোখের জলের গহীন সায়রে ডুবায়ে সকল গাঁ।
ঊদাসিনী সেই পল্লী-বালার নয়নের জল বুঝি,
কবর দেশের আন্ধারে ঘরে পথ পেয়েছিল খুঁজি।
তাই জীবনের প্রথম বেলায় ডাকিয়া আনিল সাঁঝ,
হায় অভাগিনী আপনি পরিল মরণ-বিষের তাজ।
মরিবার কালে তোরে কাছে ডেকে কহিল, বাছারে যাই,
বড় ব্যথা র'ল, দুনিয়াতে তোর মা বলিতে কেহ নাই;
দুলাল আমার, যাদুরে আমার, লক্ষ্মী আমার ওরে,
কত ব্যথা মোর আমি জানি বাছা ছাড়িয়া যাইতে তোরে।
ফোঁটায় ফোঁটায় দুইটি গন্ড ভিজায়ে নয়নজলে,
কী জানি আশিস করে গেল তোরে মরণব্যথার ছলে।

ক্ষণপরে মোরে ডাকিয়া কহিল আমার কবর গায়
স্বামীর মাথার মাথালখানিরে ঝুলাইয়া দিও বায়।
সেই যে মাথাল পচিয়া গলিয়া মিশেছে মাটির সনে,
পরাণের ব্যথা মরে নাকো সে যে কেঁদে ওঠে ক্ষণে ক্ষণে।
জোড়মানিকেরা ঘুমায়ে রয়েছে এইখানে তরুছায়,
গাছের শাখারা স্নেহের মায়ায় লুটায়ে পড়েছে গায়।
জোনাকিমেয়েরা সারারাত জাগি জ্বালাইয়া দেয় আলো,
ঝিঁঝিরা বাজায় ঘুমের নূপুর কত যেন বেসে ভালো।
হাত জোড় করে দোয়া মাঙ দাদু, রহমান খোদা! আয়;
ভেস্ত নসিব করিও আজিকে আমার বাপ ও মায়!

এখানে তোর বুজির কবর, পরীর মতন মেয়ে,
বিয়ে দিয়েছিনু কাজিদের বাড়ি বনিয়াদি ঘর পেয়ে।
এত আদরের বুজিরে তাহারা ভালবাসিত না মোটে,
হাতেতে যদিও না মারিত তারে শত যে মারিত ঠোঁটে।
খবরের পর খবর পাঠাত, দাদু যেন কাল এসে
দুদিনের তরে নিয়ে যায় মোরে বাপের বাড়ির দেশে।
শ্বশুর তাহার কশাই চামার, চাহে কি ছাড়িয়া দিতে
অনেক কহিয়া সেবার তাহারে আনিলাম এক শীতে।
সেই সোনামুখ মলিন হয়েছে ফোটে না সেথায় হাসি,
কালো দুটি চোখে রহিয়া রহিয়া অশ্রু উঠিছে ভাসি।

বাপের মায়ের কবরে বসিয়া কাঁদিয়া কাটাত দিন,
কে জানিত হায়, তাহারও পরাণে বাজিবে মরণবীণ!
কী জানি পচানো জ্বরেতে ধরিল আর উঠিল না ফিরে,
এইখানে তারে কবর দিয়েছি দেখে যাও দাদু! ধীরে।

ব্যথাতুরা সেই হতভাগিনীরে বাসে নাই কেহ ভালো,
কবরে তাহার জড়ায়ে রয়েছে বুনো ঘাসগুলি কালো।
বনের ঘুঘুরা উঁহু উঁহু করি কেঁদে মরে রাতদিন,
পাতায় পাতায় কেঁপে উঠে যেন তারি বেদনার বীণ।
হাত জোড় করে দোয়া মাঙ দাদু, আয় খোদা! দয়াময়।
আমার বু-জীর তরেতে যেন গো ভেস্ত নসিব হয়।

হেথায় ঘুমায় তোর ছোট ফুপু, সাত বছরের মেয়ে,
রামধনু বুঝি নেমে এসেছিল ভেস্তের দ্বার বেয়ে।
ছোট বয়সেই মায়েরে হারায়ে কী জানি ভাবিত সদা,
অতটুকু বুকে লুকাইয়াছিল কে জানিত কত ব্যথা!
ফুলের মতন মুখখানি তার দেখিতাম যবে চেয়ে,
তোমার দাদির ছবিখানি মোর হৃদয়ে উঠিত ছেয়ে।
বুকেতে তাহারে জড়ায়ে ধরিয়া কেঁদে হইতাম সারা,
রঙিন সাঁঝেরে ধুয়ে মুছে দিত মোদের চোখের ধারা।

একদিন গেনু গজনার হাটে তাহারে রাখিয়া ঘরে,
ফিরে এসে দেখি সোনার প্রতিমা লুটায় পথের পরে।
সেই সোনামুখ গোলগাল হাত সকলি তেমন আছে।
কী জানি সাপের দংশন পেয়ে মা আমার চলে গেছে।
আপন হস্তে সোনার প্রতিমা কবরে দিলাম গাড়ি,
দাদু! ধর-ধর বুক- ফেটে যায়, আর বুঝি নাহি পারি।
এইখানে এই কবরের পাশে আরও কাছে আয় দাদু,
কথা কস নাকো, জাগিয়া উঠিবে ঘুমভোলা মোর যাদু।
আস্তে আস্তে খুঁড়ে দেখ দেখি কঠিন মাটির তলে,

ওই দূর বনে সন্ধ্যা নামিয়ে ঘন আবিরের রাগে,
অমনি করিয়া লুটায়ে পড়িতে বড় সাধ আজ জাগে।
মসজিদ হইতে আযান হাঁকিছে বড় সকরুণ সুরে,
মোর জীবনের রোজকেয়ামত ভাবিতেছি কত দূরে।
জোড়হাত দাদু মোনাজাত কর, আয় খোদা! রহমান।
ভেস্ত নসিব করিও সকল মৃত্যু-ব্যথিত প্রাণ।

ষোল আনাই মিছে

সুকুমার রায়

বিদ্যে বোঝাই বাবুমশাই চড়ি সখের বোটে,
মাঝিরে কন, 'বলতে পারিস সূর্যি কেন ওঠে?
চাঁদটা কেন বাড়ে কমে? জোয়ার কেন আসে?'
বৃদ্ধ মাঝি অবাক হয়ে ফ্যালফ্যালিয়ে হাসে।
বাবু বলেন, 'সারা জীবন মরলিরে তুই খাটি,
জ্ঞান বিনা তোর জীবনটা যে চারি আনাই মাটি।'

খানিক বাদে কহেন বাবু, 'বলতো দেখি ভেবে
নদীর ধারা কেমনে আসে পাহাড় থেকে নেবে?
বলতো কেন লবণ পোরা সাগর ভরা পানি?'
মাঝি সে কয়, 'আরে মশাই অত কি আর জানি?'
বাবু বলেন, 'এই বয়সে জানিসনেও তা কি
জীবনটা তোর নেহাৎ খেলো, অষ্ট আনাই ফাঁকি!'

আবার ভেবে কহেন বাবু, 'বলতো ওরে বুড়ো,
কেন এমন নীল দেখা যায় আকাশের ঐ চূড়ো?
বলতো দেখি সূর্য চাঁদে গ্রহণ লাগে কেন?'
বৃদ্ধ বলে, 'আমায় কেন লজ্জা দেছেন হেন?'
বাবু বলেন, 'বলব কি আর বলব তোরে কি তা,-
দেখছি এখন জীবনটা তোর বারো আনাই বৃথা।'

খানিক বাদে ঝড় উঠেছে, ঢেউ উঠেছে ফুলে,
বাবু দেখেন, নৌকাখানি ডুবলো বুঝি দুলে!
মাঝিরে কন, 'একি আপদ! ওরে ও ভাই মাঝি,
ডুবলো নাকি নৌকা এবার? মরব নাকি আজি?'
মাঝি শুধায়, 'সাঁতার জানো?'- মাথা নাড়েন বাবু,
মূর্খ মাঝি বলে, 'মশাই, এখন কেন কাবু?
বাঁচলে শেষে আমার কথা হিসেব করো পিছে,
তোমার দেখি জীবনখানা ষোল আনাই মিছে!'

তাহারেই পড়ে মনে
বেগম সুফিয়া কামাল

হে কবি! নীরব কেন-ফাল্গুন যে এসেছে ধরায়,
বসন্তে বরিয়া তুমি লবে না কি তব বন্দনায়?
কহিল সে স্নিগ্ধ আঁখি তুলি-
"দখিন দুয়ার গেছে খুলি?
বাতাবী নেবুর ফুল ফুটেছে কি? ফুটেছে কি
আমের মুকুল?
দখিনা সমীর তার গন্ধে গন্ধে হয়েছে কি অধীর
আকুল?

"এখনো দেখনি তুমি?" কহিলাম "কেন কবি আজ
এমন উন্মনা তুমি? কোথা তব নব পুষ্পসাজ?"
কহিল সে সুদূরে চাহিয়া-
"অলখের পাথার বাহিয়া
তরী তার এসেছে কি? বেজেছে কি আগমনী গান?
ডেকেছে কি সে আমারে? -শুনি নাই, রাখিনি সন্ধান।

কহিলাম "ওগো কবি, রচিয়া লহ না আজও গীতি,
বসন্ত-বন্দনা তব কণ্ঠে শুনি-এ মোর মিনতি।"
কহিল সে মৃদু মধুস্বরে-
"নাই হ'ল, না হোক এবারে-
আমার গাহিতে গান! বসন্তরে আনিতে ধরিয়া-
রহেনি, সে ভুলেনি তো, এসেছে তো ফাল্‌গুন স্মরিয়া।"

কহিলাম "ওগো কবি, অভিমান করেছ কি তাই?
যদিও এসেছে তবু তুমি তারে করিলে বৃথাই।"
কহিল সে পরম হেলায়-
"বৃথা কেন? ফাগুন বেলায়
ফুল কি ফোটে নি শাখে? পুষ্পারতি লভে নি কি ঋতুর রাজন?
মাধবী কুঁড়ির বুকে গন্ধ নাহি? করে নি সে অর্ঘ্য বিরচন?"

"হোক, তবু বসন্তের প্রতি কেন এই তব তীব্র
বিমুখতা?"
কহিলাম "উপেক্ষায় ঋতুরাজে কেন কবি দাও
তুমি ব্যথা?"
কহিল সে কাছে সরি আসি-
"কুহেলী উত্তরী তলে মাঘের সন্ন্যাসী-
গিয়াছে চলিয়া ধীরে পুষ্পশূন্য দিগন্তের পথে
রিক্ত হস্তে। তাহারেই পড়ে মনে, ভুলিতে পারি না
কোন মতে।"

স্বাধীনতা তুমি
শামসুর রাহমান

স্বাধীনতা তুমি
রবিঠাকুরের অজর কবিতা, অবিনাশী গান।
স্বাধীনতা তুমি
কাজী নজরুলের ঝাঁকড়া চুলের বাবরি দোলানো
মহান পুরুষ, সৃষ্টিসুখের উল্লাসে কাঁপা-
স্বাধীনতা তুমি
শহিদ মিনারে অমর একুশে ফেব্রুয়ারির উজ্জ্বল সভা
স্বাধীনতা তুমি
পতাকা-শোভিত শ্লোগান-মুখর ঝাঁঝালো মিছিল।
স্বাধীনতা তুমি
ফসলের মাঠে কৃষকের হাসি।
স্বাধীনতা তুমি
রোদেলা দুপুরে মধ্যপুকুরে গ্রাম্য মেয়ের অবাধ সাঁতার।
স্বাধীনতা তুমি
মজুর যুবার রোদে ঝলসিত দক্ষ বাহুর গ্রন্থিল পেশী।
স্বাধীনতা তুমি
অন্ধকারের খাঁ খাঁ সীমান্তে মুক্তিসেনার চোখের ঝিলিক।
স্বাধীনতা তুমি
বটের ছায়ায় তরুণ মেধাবী শিক্ষার্থীর
শানিত কথার ঝলসানি-লাগা সতেজ ভাষণ।
স্বাধীনতা তুমি
চা-খানায় আর মাঠে-ময়দানে ঝোড়া সংলাপ।
স্বাধীনতা তুমি
কালবোশেখীর দিগন্তজোড়া মত্ত ঝাপটা।
স্বাধীনতা তুমি
শ্রাবণে অকূল মেঘনার বুক
স্বাধীনতা তুমি পিতার কোমল জায়নামাজের উদার
জমিন।
স্বাধীনতা তুমি
উঠানে ছড়ানো মায়ের শুভ্র শাড়ির কাঁপন।
স্বাধীনতা তুমি
বোনের হাতের নম্র পাতায় মেহেদীর রঙ।
স্বাধীনতা তুমি বন্ধুর হাতে তারার মতন জ্বলজ্বলে
এক রাঙা পোস্টার।
স্বাধীনতা তুমি
গৃহিণীর ঘন খোলা কালো চুল,
হাওয়ায় হাওয়ায় বুনো উদ্দাম।
স্বাধীনতা তুমি
খোকার গায়ের রঙিন কোর্তা,
খুকীর অমন তুলতুলে গালে
রৌদ্রের খেলা।
স্বাধীনতা তুমি
বাগানের ঘর, কোকিলের গান,
বয়েসী বটের ঝিলিমিলি পাতা,
যেমন ইচ্ছে লেখার আমার কবিতার খাতা।

জোনাকিরা
আহসান হাবীব

তারা- একটি দু'টি তিনটি করে এলো
তখন- বৃষ্টি-ভেজা শীতের হাওয়া
বইছে এলোমেলো,
তারা- একটি দু'টি তিনটি করে এলো।
থই থই থই অন্ধকারে
ঝাউয়ের শাখা দোলে
সেই- অন্ধকারে শন শন শন
আওয়াজ শুধু তোলে।
ভয়েতে বুক চেপে
ঝাউয়ের শাখা, পাখির পাখা
উঠছে কেঁপে কেঁপে।
তখন- একটি দু'টি তিনটি করে এসে
এক শো দু শো তিন শো করে
ঝাঁক বেঁধে যায় শেষে!
তারা- বললে ও ভাই, ঝাউয়ের শাখা,
বললে ও ভাই পাখি,
অন্ধকারে ভয় পেয়েছো নাকি?
যখন- বললে, তখন পাতার ফাঁকে
কী যেন চমকালো।
অবাক অবাক চোখের চাওয়ায়
একটুখানি আলো।
যখন- ছড়িয়ে গেলো ডালপালাতে
সবাই দলে দলে
তখন- ঝাউয়ের শাখায়- পাখির পাখায়
হীরে-মানিক জ্বলে।
যখন- হীরে-মানিক জ্বলে
তখন- থমকে দাঁড়ায় শীতের হাওয়া
চমকে গিয়ে বলে-
খুশি খুশি মুখটি নিয়ে
তোমরা এলে কারা?
তোমরা কি ভাই নীল আকাশের তারা?
আলোর পাখি নাম জোনাকি
জাগি রাতের বেলা,
নিজকে জ্বেলে এই আমাদের
ভালোবাসার খেলা।
তারা নইকো- নইকো তারা
নই আকাশের চাঁদ
ছোট বুকে আছে শুধুই
ভালোবাসার সাধ।

দূরের পাল্লা
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

ছিপখান তিন-দাঁড়-
তিনজন মাল্লা
চৌপর দিন-ভোর
দ্যায় দূর-পাল্লা!
পাড়ময় ঝোপঝাড়
জঙ্গল-জঞ্জাল,
জলময় শৈবাল
পান্নার টাকশাল।
কঞ্চির তীর-ঘর
ঐ-চর জাগছে,
বন-হাঁস ডিম তার
শ্যাওলায় ঢাকছে।
চুপ চুপ -ওই ডুব
দ্যায় পান্ কৌটি
দ্যায় ডুব টুপ টুপ
ঘোমটার বৌটি!
ঝকঝক কলসীর
বক্ বক্ শোন্ গো
ঘোমটার ফাঁক বয়
মন উন্মন গো।
তিন-দাঁড় ছিপখান
মন্থর যাচ্ছে,
তিনজন মাল্লায়
কোন গান গাচ্ছে?
রূপশালি ধান বুঝি
এইদেশে সৃষ্টি,
ধুপছায়া যার শাড়ি
তার হাসি মিষ্টি।
মুখখানি মিষ্টিরে
চোখদুটি ভোমরা
ভাব-কদমের-ভরা
রূপ দেখ তোমরা!
ময়নামতীর জুটি
ওর নামই টগরী,
ওর পায়ে ঢেউ ভেঙে
জল হোলো গোখরী!
ডাক পাখী ওর লাগি'
ডাক ডেকে হদ্দ,
ওর তরে সোঁত-জলে
ফুল ফোটে পদ্ম।
ওর তরে মন্থরে
নদ হেথা চলছে,
জলপিপি ওর মৃদু
বোল বুঝি বোলছে।
দুইতীরে গ্রামগুলি
ওর জয়ই গাইছে,
গঞ্জে যে নৌকা সে
ওর মুখই চাইছে।
আটকেছে যেই ডিঙা
চাইছে সে পর্শ,
সঙ্কটে শক্তি ও
সংসারে হর্ষ।
পান বিনে ঠোঁট রাঙা
চোখ কালো ভোমরা,
রূপশালী-ধান-ভানা
রূপ দেখ তোমরা।

পাঞ্জেরি

ফররুখ আহমদ

রাত পোহাবার কত দেরি পাঞ্জেরি?
এখনো তোমার আসমান ভরা মেঘে?
সেতারা, হেলার এখনো ওঠেনি জেগে?
তুমি মাস্তুলে, আমি দাঁড় টানি ভুলে;
অসীম কুয়াশা জাগে শূন্যতা ঘেরি।
রাত পোহাবার কত দেরি পাঞ্জেরি?
দীঘল রাতের শ্রান্তসফর শেষে
কোন দরিয়ার কালো দিগন্তে আমরা পড়েছি এসে?
এ কী ঘন-সিয়া জিন্দেগানীর বা'ব
তোলে মর্সিয়া ব্যথিত দিলের তুফান-শ্রান্ত খা'ব
অস্ফুট হয়ে ক্রমে ডুবে যায় জীবনের জয়ভেরী।
তুমি মাস্তুলে, আমি দাঁড় টানি ভুলে;
সম্মুখে শুধু অসীম কুয়াশা হেরি।
রাত পোহাবার কত দেরি পাঞ্জেরি?
বন্দরে বসে যাত্রীরা দিন গোনে,
বুঝি মৌসুমী হাওয়ায় মোদের জাহাজের ধ্বনি শোনে,
বুঝি কুয়াশায়, জোছনা- মায়ায় জাহাজের পাল দেখে।
আহা, পেরেশান মুসাফির দল।
দরিয়া কিনারে জাগে তক্‌দিরে
নিরাশায় ছবি এঁকে!
পথহারা এই দরিয়া-সোঁতারা ঘুরে
চলেছি কোথায়? কোন সীমাহীন দূরে?
তুমি মাস্তুলে, আমি দাঁড় টানি ভুলে;
একাকী রাতের গান জুলমাত হেরি!
রাত পোহাবার কত দেরি পাঞ্জেরি?
শুধু গাফলতে শুধু খেয়ালের ভুলে,
দরিয়া- অথই ভ্রান্তি- নিয়াছি ভুলে,
আমাদেরি ভুলে পানির কিনারে মুসাফির দল বসি
দেখেছে সভয়ে অস্ত গিয়াছে তাদের সেতারা, শশী।
মোদের খেলায় ধুলায় লুটায়ে পড়ি।
কেটেছে তাদের দুর্ভাগ্যের বিস্বাদ শর্বরী।
সওদাগরের দল মাঝে মোরা ওঠায়েছি আহাজারি,
ঘরে ঘরে ওঠে ক্রন্দনধ্বনি আওয়াজ শুনছি তারি।
ওকি বাতাসের হাহাকার,- ও কি
রোনাজারি ক্ষুধিতের!
ও কি দরিয়ার গর্জন- ও কি বেদনা মজলুমের!
ও কি ধাতুর পাঁজরায় বাজে মৃত্যুর জয়ভেরী।
পাঞ্জেরি!
জাগো বন্দরে কৈফিয়তের তীব্র ভ্রুকুটি হেরি,
জাগো অগণন ক্ষুধিত মুখের নীরব ভ্রুকুটি হেরি!
দেখ চেয়ে দেখ সূর্য ওঠার কত দেরি, কত দেরি!!

আমার পরিচয়

সৈয়দ শামসুল হক

আমি জন্মেছি বাংলায়
আমি বাংলায় কথা বলি।
আমি বাংলার আলপথ দিয়ে, হাজার বছর চলি।
চলি পলিমাটি কোমলে আমার চলার চিহ্ন ফেলে।
তেরশত নদী শুধায় আমাকে, কোথা থেকে তুমি এলে ?

আমি তো এসেছি চর্যাপদের অক্ষরগুলো থেকে
আমি তো এসেছি সওদাগরের ডিঙার বহর থেকে।
আমি তো এসেছি কৈবর্তের বিদ্রোহী গ্রাম থেকে
আমি তো এসেছি পালযুগ নামে চিত্রকলার থেকে।

এসেছি বাঙালি পাহাড়পুরের বৌদ্ধবিহার থেকে
এসেছি বাঙালি জোড়বাংলার মন্দির বেদি থেকে।
এসেছি বাঙালি বরেন্দ্রভূমে সোনা মসজিদ থেকে
এসেছি বাঙালি আউল-বাউল মাটির দেউল থেকে।

আমি তো এসেছি সার্বভৌম বারোভূঁইয়ার থেকে
আমি তো এসেছি 'কমলার দীঘি' 'মহুয়ার পালা' থেকে।
আমি তো এসেছি তিতুমীর আর হাজী শরীয়ত থেকে
আমি তো এসেছি গীতাঞ্জলি ও অগ্নিবীণার থেকে।

এসেছি বাঙালি ক্ষুদিরাম আর সূর্যসেনের থেকে
এসেছি বাঙালি জয়নুল আর অবন ঠাকুর থেকে।
এসেছি বাঙালি রাষ্ট্রভাষার লাল রাজপথ থেকে
এসেছি বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর থেকে।

আমি যে এসেছি জয়বাংলার বজ্রকণ্ঠ থেকে
আমি যে এসেছি একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ থেকে।
এসেছি আমার পেছনে হাজার চরণচিহ্ন ফেলে
শুধাও আমাকে 'এতদূর তুমি কোন প্রেরণায় এলে ?

তবে তুমি বুঝি বাঙালি জাতির ইতিহাস শোনো নাই-
'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।'
একসাথে আছি, একসাথে বাঁচি, আজো একসাথে থাকবোই
সব বিভেদের রেখা মুছে দিয়ে সাম্যের ছবি আঁকবোই।

পরিচয়ে আমি বাঙালি, আমার আছে ইতিহাস গর্বের-
কখনোই ভয় করিনাকো আমি উদ্যত কোনো খড়্গের।
শত্রুর সাথে লড়াই করেছি, স্বপ্নের সাথে বাস;
অস্ত্রেও শান দিয়েছি যেমন শস্য করেছি চাষ;
একই হাসিমুখে বাজায়েছি বাঁশি, গলায় পরেছি ফাঁস;
আপোষ করিনি কখনোই আমি- এই হ'লো ইতিহাস।

এই ইতিহাস ভুলে যাবো আজ, আমি কি তেমন সন্তান ?
যখন আমার জনকের নাম শেখ মুজিবুর রহমান;
তারই ইতিহাস প্রেরণায় আমি বাংলায় পথ চলি-
চোখে নীলাকাশ, বুকে বিশ্বাস পায়ে উর্বর পলি।

মুক্তিসেনা
সুকুমার বড়ুয়া

ধন্য সবাই ধন্য
অস্ত্র ধরে যুদ্ধ করে
মাতৃভূমির জন্য।

ধরল যারা জীবন বাজি
হলেন যারা শহীদ গাজি
লোভের টানে হয়নি যারা
ভিনদেশিদের পণ্য।

দেশের তরে ঝাঁপিয়ে পড়ে
শক্ত হাতে ঘায়েল করে
সব হানাদার সৈন্য
ধন্য ওরাই ধন্য।

এক হয়ে সব শ্রমিক কিষাণ
ওড়ায় যাদের বিজয় নিশান
ইতিহাসের সোনার পাতায়
ওরাই আগে গণ্য।

বনলতা সেন
জীবনানন্দ দাস

হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে,
সিংহল সমুদ্র থেকে আরো দূর অন্ধকারে মালয় সাগরে
অনেক ঘুরেছি আমি; বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে
সেখানে ছিলাম আমি; আরো দূর অন্ধকার বিদর্ভ নগরে;
আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন,
আমারে দুদণ্ড শান্তি দিয়েছিল নাটোরের বনলতা সেন।

চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা,
মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য; অতিদূর সমুদ্রের'পর
হাল ভেঙ্গে যে নাবিক হারায়েছে দিশা
সবুজ ঘাসের দেশ যখন সে চোখে দেখে দারুচিনি-দ্বীপের ভিতর,
তেমনই দেখেছি তারে অন্ধকারে; বলেছে সে, 'এতোদিন কোথায় ছিলেন?'
পাখির নীড়ের মত চোখ তুলে চাওয়া নাটোরের বনলতা সেন।

সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন
সন্ধ্যা আসে; ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল;
পৃথিবীর সব রঙ মুছে গেলে পাণ্ডুলিপি করে আয়োজন,
তখন গল্পের তরে জোনাকির রঙে ঝিলমিল।
সব পাখি ঘরে আসে সব নদী; ফুরায় এ-জীবনের সব লেনদেন;
থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।

আযান
কায়কোবাদ

কে ওই শোনাল মোরে আযানের ধ্বনি।
মর্মে মর্মে সেই সুর, বাজিল কি সুমধুর
আকুল হইল প্রাণ, নাচিল ধমনী।
কি মধুর আযানের ধ্বনি!
আমি তো পাগল হয়ে সে মধুর তানে,
কি যে এক আকর্ষণে, ছুটে যাই মুগ্ধমনে
কি নিশীথে, কি দিবসে মসজিদের পানে।
হৃদয়ের তারে তারে, প্রাণের শোণিত-ধারে,
কি যে এক ঢেউ উঠে ভক্তির তুফানে-
কত সুধা আছে সেই মধুর আযানে।
নদী ও পাখির গানে তারই প্রতিধ্বনি।
ভ্রমরের গুণ-গানে সেই সুর আসে কানে
কি এক আবেশে মুগ্ধ নিখিল ধরণী।
ভূধরে, সাগরে জলে নির্ঝরণী কলকলে,
আমি যেন শুনি সেই আযানের ধ্বনি।
আহা যবে সেই সুর সুমধুর স্বরে,
ভাসে দূরে সায়াহ্নের নিথর অম্বরে,
প্রাণ করে আনচান, কি মধুর সে আযান,
তারি প্রতিধ্বনি শুনি আত্মার ভিতরে।
নীরব নিঝুম ধরা, বিশ্বে যেন সবই মরা,
এতটুকু শব্দ যবে নাহি কোনো স্থানে,
মুয়াযযিন উচ্চৈঃস্বরে দাঁড়ায়ে মিনার 'পরে
কি সুধা ছড়িয়ে দেয় উষার আযানে!
জাগাইতে মোহমুগ্ধ মানব সন্তানে।
আহা কি মধুর ওই আযানের ধ্বনি।
মর্মে মর্মে সেই সুর বাজিল কি সমধুর
আকুল হইল প্রাণ, নাচিল ধমনী।

ছাড়পত্র
সুকান্ত ভট্টাচার্য

যে শিশু ভূমিষ্ট হল আজ রাত্রে
তার মুখে খবর পেলুমঃ
সে পেয়েছে ছাড়পত্র এক,
নতুন বিশ্বের দ্বারে তাই ব্যক্ত করে অধিকার
জন্মমাত্র সুতীব্র চিৎকারে।
খর্বদেহ নিঃসহায়,
তবু তার মুষ্টিবদ্ধ হাত উত্তোলিত,
উদ্ভাসিত কী এক দুর্বোধ্য প্রতিজ্ঞায়।
সে ভাষা বুঝে না কেউ,
কেউ হাসে, কেউ করে মৃদু তিরস্কার।
আমি কিন্তু মনে মনে বুঝেছি সে ভাষা
পেয়েছি নতুন চিঠি আসন্ন যুগের-
পরিচয়-পত্র পড়ি ভূমিষ্ট শিশুর
অস্পষ্ট কুয়াশাভরা চোখে।
এসেছে নতুন শিশু, তাকে ছেড়ে দিতে হবে স্থান;
জীর্ণ পৃথিবীতে ব্যর্থ, মৃত আর ধ্বংসস্তুপ-পিঠে
চলে যেতে হবে আমাদের।
চলে যাব- তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ
প্রাণপণে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল
এ বিশ্বকে এ-শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি-
নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।
অবশেষে সব কাজ সেরে,
আমার দেহের রক্তে নতুন শিশুকে
করে যাব আশীর্বাদ,
তারপর হব ইতিহাস।

মজার দেশ
যোগীন্দ্রনাথ দত্ত

এক যে আছে মজার দেশ, সব রকমে ভালো,
রাত্তিরেতে বেজায় রোদ, দিনে চাঁদের আলো!
আকাশ সেথা সবুজবরণ গাছের পাতা নীল;
ডাঙ্গায় চরে রুই কাতলা জলের মাঝে চিল!
সেই দেশেতে বেড়াল পালায়, নেংটি-ইঁদুর দেখে;
ছেলেরা খায় 'ক্যাস্টর-অয়েল' -রসগোল্লা রেখে!
মণ্ডা-মিঠাই তেতো সেথা, ওষুধ লাগে ভালো;
অন্ধকারটা সাদা দেখায়, সাদা জিনিস কালো!
ছেলেরা সব খেলা ফেলে বই নে বসে পড়ে;
মুখে লাগাম দিয়ে ঘোড়া লোকের পিঠে চড়ে!
ঘুড়ির হাতে বাঁশের লাটাই, উড়তে থাকে ছেলে;
বড়শি দিয়ে মানুষ গাঁথে, মাছেরা ছিপ্ ফেলে!

জিলিপি সে তেড়ে এসে, কামড় দিতে চায়;
কচুরি আর রসগোল্লা ছেলে ধরে খায়!
পায়ে ছাতি দিয়ে লোকে হাতে হেঁটে চলে!
ডাঙ্গায় ভাসে নৌকা-জাহাজ, গাড়ি ছোটে জলে!

মজার দেশের মজার কথা বলবো কত আর;
চোখ খুললে যায় না দেখা মুদলে পরিষ্কার!

তখন সত্যি মানুষ ছিলাম
আসাদ চৌধুরী

নদীর জলে আগুন ছিল
আগুন ছিল বৃষ্টিতে
আগুন ছিল বীরাঙ্গনার
উদাস করা দৃষ্টিতে।
আগুন ছিল গানের সুরে
আগুন ছিল কাব্যে,
মরার চোখে আগুন ছিল
এ কথা কে ভাববে?
কুকুর-বেড়াল থাবা হাঁকায়
ফোঁসে সাপের ফণা
শিং কৈ মাছ রুখে দাঁড়ায়
জ্বলে বালির কণা।
আগুন ছিল মুক্তিসেনার
স্বপ্ন-ঢলের বন্যায়-
প্রতিবাদের প্রবল ঝড়ে
কাঁপছিল সব অন্যায়।
এখন এসব স্বপ্নকথা
দূরের শোনা গল্প,
তখন সত্যি মানুষ ছিলাম
এখন আছি অল্প।

নোলক
আল মাহমুদ

আমার মায়ের সোনার নোলক হারিয়ে গেল শেষে
হেথায় খুঁজি হোথায় খুঁজি সারা বাংলাদেশে।
নদীর কাছে গিয়েছিলাম, আছে তোমার কাছে?
হাত দিওনা আমার শরীর ভরা বোয়াল মাছে।
বললো কেঁদে তিতাস নদী হরিণবেড়ের বাঁকে
শাদা পালক বকরা যেথায় পাখ ছড়িয়ে থাকে।

জল ছাড়িয়ে দল হারিয়ে গেলাম বনের দিক
সবুজ বনের হরিণ টিয়ে করে রে ঝিকমিক।
বনের কাছে এই মিনতি, ফিরিয়ে দেবে ভাই,
আমার মায়ের গয়না নিয়ে ঘরকে যেতে চাই।

কোথায় পাবো তোমার মায়ের হারিয়ে যাওয়া ধন
আমরা তো সব পাখপাখালি বনের সাধারণ।
সবুজ চুলে ফুল পিন্দেছি নোলক পরি নাতো!
ফুলের গন্ধ চাও যদি নাও, হাত পাতো হাত পাতো
বলে পাহাড় দেখায় তাহার আহার ভরা বুক
হাজার হরিণ পাতার ফাঁকে বাঁকিয়ে রাখে মুখ।
এলিয়ে খোঁপা রাত্রি এলেন, ফের বাড়ালাম পা
আমার মায়ের গয়না ছাড়া ঘরকে যাবো না।

কোথায় রাখিব আজ এ সুখের ভার,
চিত্তরঞ্জন দাশ

কোথায় রাখিব আজ এ সুখের ভার,
কারে দিব আজ মোর অশ্রু উপহার!
এ অজানিত সুখ, এ দুঃখ অজানা,-
বাধাহীন এ উৎসবে মানে না যে মানা।
সকল সুখের রাশি পুষ্প হ'য়ে ফুটে,
সব দুঃখ আজ মোর গীত হ'য়ে উঠে!
বিচিত্র এ গীত লোক, পুষ্পের কানন!-
কি জানি কেমন করে কাঁপিছে এমন!-
কোথায় রাখিব বল অন্তরের ভার,
তোমার উৎসবে আজি, হে সিন্ধু আমার!

চিঠি দিও

মহাদেব সাহা

করুণা করে হলেও চিঠি দিও, খামে ভরে তুলে দিও
আঙুলের মিহিন সেলাই
ভুল বানানেও লিখো প্রিয়, বেশি হলে কেটে ফেলো তাও,
এটুকু সামান্য দাবি চিঠি দিও, তোমার শাড়ির মতো
অক্ষরের পাড়-বোনা একখানি চিঠি।
চুলের মতন কোনো চিহ্ন দিও বিস্ময় বোঝাতে যদি চাও
সমুদ্র বোঝাতে চাও, মেঘ চাও, ফুল, পাখি, সবুজ পাহাড়
বর্ণনা আলস্য লাগে তোমার চোখর মতো চিহ্ন কিছু দিও!
আজো তো অমল আমি চিঠি চাই, পথ চেয়ে আছি
আসবেন অচেনা রাজার লোক
তার হাতে চিঠি দিও, বাড়ি পৌঁছে দেবে।
এক কোণে শীতের শিশির দিও একফোঁটা, সেন্টের শিশির চেয়ে
তৃণমূল থেকে তোলা ঘ্রাণ
এমন ব্যস্ততা যদি শুদ্ধ করে একটি শব্দই শুধু লিখো, তোমার কুশল!
ওই তো রাজার লোক যায় ক্যাম্বিসের জুতো পায়ে,কাঁধে ব্যাগ,
হাতে কাগজের একগুচ্ছ জীজন ফ্লাওয়ার
কারো কৃষ্ণচূড়া, কারো উদাসীন উইলোর ঝোপ, কারো নিবিড় বকুল
এর কিছুই আমার নয় আমি অকারণ
হাওয়ায় চিৎকার তুলে বলি, আমার কি কোনো কিছু নাই?
করুণা করেও হলে চিঠি দিও, ভুলে গিয়ে ভুল করে একখানি চিঠি
দিও খামে
কিছুই লেখার নেই তবু লিখো একটি পাখির শিস
একটি ফুলের ছোট নাম,
টুকিটাকি হয়তো হারিয়ে গেছে কিছু হয়তো পাওনি খুঁজে
সেইসব চুপচাপ কোনো দুপুরবেলার গল্প
খুব মেঘ করে এলে কখনো কখনো বড়ো একা লাগে, তাই লিখো
করুণা করেও হলে চিঠি দিও, মিথ্যা করে হলে বলো, ভালোবাসি।

কেউ কথা রাখেনি

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

কেউ কথা রাখেনি, তেত্রিশ বছর কাটলো
কেউ কথা রাখেনি
ছেলেবেলায় এক বোষ্টুমি তার আগমনী
গান হঠাৎ থামিয়ে বলেছিলো
শুক্লা দ্বাদশীর দিন অন্তরাটুকু শুনিয়ে যাবে
তারপর কত চন্দ্রভূক অমাবস্যা চলে গেল,
কিন্তু সেই বোষ্টুমি আর
এলো না
পঁচিশ বছর প্রতীক্ষায় আছি ।

মামাবাড়ির মাঝি নাদের আলী বলেছিল,
বড় হও দাদাঠাকুর
তোমাকে আমি তিন প্রহরের বিল দেখাতে
নিয়ে যাবো
সেখানে পদ্মফুলের মাথায় সাপ আর ভ্রমর
খেলা করে !
নাদের আলি, আমি আর কত বড় হবো ?
আমার মাথা এই ঘরের ছাদ
ফুঁড়ে আকাশ স্পর্শ করলে তারপর তুমি
আমায় তিন প্রহরের বিল দেখাবে ?

একটাও রয়্যাল গুলি কিনতে পারিনি
কখনো
লাঠি-লজেন্স দেখিয়ে দেখিয়ে চুষেছে
লস্কর বাড়ির ছেলেরা
ভিখারীর মতন চৌধুরীদের গেটে দাঁড়িয়ে
দেখেছি ভেতরে রাস উৎসব
অবিরল রঙের ধারার মধ্যে সুবর্ণ
কঙ্কণ পরা ফর্সা রমণীরা কতরকম আমোদে হেসেছে

আমার দিকে তারা ফিরেও চায়নি !
বাবা আমার কাঁধ ছুঁয়ে বলেছিলেন, দেখিস,
একদিন আমরাও
বাবা এখন অন্ধ, আমাদের দেখা হয়নি
কিছুই
সেই রয়্যাল গুলি, সেই লাঠি-লজেন্স, সেই রাস উৎসব
আমায় কেউ ফিরিয়ে দেবেনা !

বুকের মধ্যে সুগন্ধি রুমাল রেখে বরুণা
বলেছিল,
যেদিন আমায় সত্যিকারের ভালবাসবে
সেদিন আমার বুকেও এরকম আতরের
গন্ধ হবে !
ভালবাসার জন্য আমি হাতের মুঠোয় প্রাণ নিয়েছি
দুরন্ত ষাঁড়ের চোখে বেঁধেছি লাল কাপড়
বিশ্ব সংসার তন্ন তন্ন করে খুঁজে এনেছি ১০৮ নীলপদ্ম
তবু কথা রাখেনি বরুণা, এখন তার বুকে
শুধুই মাংসের গন্ধ
এখনো সে যে কোন নারী !
কেউ কথা রাখেনি, তেত্রিশ বছর কাটলো,
কেউ কথা রাখেনা !

পাছে লোকে কিছু বলে
কামিনী রায়

করিতে পারি না কাজ
সদা ভয় সদা লাজ
সংশয়ে সংকল্প সদা টলে-
পাছে লোকে কিছু বলে।

আড়ালে আড়ালে থাকি
নীরবে আপনা ঢাকি,
সম্মুখে চরণ নাহি চলে
পাছে লোকে কিছু বলে।

হৃদয়ে বুদবুদ মত
উঠে চিন্তা শুভ্র কত,
মিশে যায় হৃদয়ের তলে,
পাছে লোকে কিছু বলে।

কাঁদে প্রাণ যবে আঁখি
সযতনে শুকায়ে রাখি;-
নিরমল নয়নের জলে,
পাছে লোকে কিছু বলে।

একটি স্নেহের কথা
প্রশমিতে পারে ব্যথা-
চলে যাই উপেক্ষার ছলে,
পাছে লোকে কিছু বলে।

মহৎ উদ্দেশ্য যবে,
এক সাথে মিলে সবে,
পারি না মিলিতে সেই দলে,
পাছে লোকে কিছু বলে।

বিধাতা দেছেন প্রাণ
থাকি সদা ম্রিয়মাণ;
শক্তি মরে ভীতির কবলে,
পাছে লোকে কিছু বলে।

পারিব না

কালীপ্রসন্ন ঘোষ

পারিব না এ কথাটি বলিও না আর
কেন পারিবে না তাহা ভাব এক বার,
পাঁচ জনে পারে যাহা,
তুমিও পারিবে তাহা,
পার কি না পার কর যতন আবার
এক বারে না পারিলে দেখ শত বার।
পারিব না বলে মুখ করিও না ভার,
ও কথাটি মুখে যেন না শুনি তোমার,
অলস অবোধ যারা
কিছুই পারে না তারা,
তোমায় তো দেখি না ক তাদের আকার
তবে কেন পারিব না বল বার বার?
জলে না নামিলে কেহ শিখে না সাঁতার
হাঁটিতে শিখে না কেহ না খেয়ে আছাড়,
সাঁতার শিখিতে হলে
আগে তবে নাম জলে,
আছাড়ে করিয়া হেলা, হাঁট বার বার
পারিব বলিয়া সুখে হও আগুসার।

আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি

আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ

আমি আমার পূর্বপুরুষের কথা বলছি।
তাঁর করতলে পলিমাটির সৌরভ ছিল
তাঁর পিঠে রক্তজবার মত ক্ষত ছিল।
তিনি অতিক্রান্ত পাহাড়ের কথা বলতেন
অরণ্য এবং শ্বাপদের কথা বলতেন
পতিত জমি আবাদের কথা বলতেন
তিনি কবি এবং কবিতার কথা বলতেন।
জিহ্বায় উচ্চারিত প্রতিটি সত্য শব্দ কবিতা,
কর্ষিত জমির প্রতিটি শস্যদানা কবিতা।
যে কবিতা শুনতে জানে না
সে ঝড়ের আর্তনাদ শুনবে।
যে কবিতা শুনতে জানে না
সে দিগন্তের অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে।
যে কবিতা শুনতে জানে না
সে আজন্ম ক্রীতদাস থেকে যাবে।
আমি উচ্চারিত সত্যের মতো
স্বপ্নের কথা বলছি।
উনুনের আগুনে আলোকিত
একটি উজ্জ্বল জানালার কথা বলছি।
আমি আমার মা'য়ের কথা বলছি,
তিনি বলতেন প্রবহমান নদী
যে সাঁতার জানে না তাকেও ভাসিয়ে রাখে।
যে কবিতা শুনতে জানে না
সে নদীতে ভাসতে পারে না।
যে কবিতা শুনতে জানে না
সে মাছের সঙ্গে খেলা করতে পারে না।
যে কবিতা শুনতে জানে না
সে মা'য়ের কোলে শুয়ে গল্প শুনতে পারে না
আমি কিংবদন্তির কথা বলছি
আমি আমার পূর্বপুরুষের কথা বলছি।
আমি বিচলিত স্নেহের কথা বলছি
গর্ভবতী বোনের মৃত্যুর কথা বলছি
আমি আমার ভালোবাসার কথা বলছি।
ভালোবাসা দিলে মা মরে যায়
যুদ্ধ আসে ভালোবেসে
মা'য়ের ছেলেরা চলে যায়,
আমি আমার ভাইয়ের কথা বলছি।
যে কবিতা শুনতে জানে না
সে সন্তানের জন্য মরতে পারে না।
যে কবিতা শুনতে জানে না
সে ভালোবেসে যুদ্ধে যেতে পারে না।
যে কবিতা শুনতে জানে না
সে সূর্যকে হৃদপিন্ডে ধরে রাখতে পারে না।
আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি
আমি আমার পূর্ব পুরুষের কথা বলছি
তাঁর পিঠে রক্তজবার মত ক্ষত ছিল
কারণ তিনি ক্রীতদাস ছিলেন।
আমরা কি তা'র মতো কবিতার কথা বলতে পারবো,
আমরা কি তা'র মতো স্বাধীনতার কথা বলতে পারবো!
তিনি মৃত্তিকার গভীরে
কর্ষণের কথা বলতেন
অবগাহিত ক্ষেত্রে
পরিচ্ছন্ন বীজ বপনের কথা বলতেন
সবত্সা গাভীর মত
দুগ্ধবতী শস্যের পরিচর্যার কথা বলতেন
তিনি কবি এবং কবিতার কথা বলতেন।
যে কর্ষণ করে তাঁর প্রতিটি স্বেদবিন্দু কবিতা
কর্ষিত জমির প্রতিটি শস্যদানা কবিতা।
যে কবিতা শুনতে জানে না
শস্যহীন প্রান্তর তাকে পরিহাস করবে।
যে কবিতা শুনতে জানে না
সে মাতৃস্তন্য থেকে বঞ্চিত হবে।
যে কবিতা শুনতে জানে না

সে আজন্ম ক্ষুধার্ত থেকে যাবে।
যখন প্রবঞ্চক ভূস্বামীর প্রচন্ড দাবদাহ
আমাদের শস্যকে বিপর্যস্ত করলো
তখন আমরা শ্রাবণের মেঘের মত
যূথবদ্ধ হলাম।
বর্ষণের স্নিগ্ধ প্রলেপে
মৃত মৃত্তিকাকে সঞ্জীবিত করলাম।
বারিসিক্ত ভূমিতে
পরিচ্ছন্ন বীজ বপন করলাম।
সুগঠিত স্বেদবিন্দুর মত
শস্যের সৌকর্য অবলোকন করলাম,
এবং এক অবিশ্বাস্য আঘ্রাণ
আনিঃশ্বাস গ্রহণ করলাম।
তখন বিষসর্প প্রভুগণ
অন্ধকার গহ্বরে প্রবেশ করলো
এবং আমরা ঘন সন্নিবিষ্ট তাম্রলিপির মত
রৌদ্রালোকে উদ্ভাসিত হলাম।
তখন আমরা সমবেত কণ্ঠে
কবিতাকে ধারণ করলাম।
দিগন্ত বিদীর্ণ করা বজ্রের উদ্ভাসন কবিতা
রক্তজবার মত প্রতিরোধের উচ্চারণ কবিতা।
যে কবিতা শুনতে জানে না
পরভৃতের গ্লানি তাকে ভূলুণ্ঠিত করবে।
যে কবিতা শুনতে জানে না
অভ্যুত্থানের জলোচ্ছ্বাস তাকে নতজানু করবে।
যে কবিতা শুনতে জানে না
পলিমাটির সৌরভ তাকে পরিত্যাগ করবে।
আমি কিংবদন্তির কথা বলছি
আমি আমার পূর্বপুরুষের কথা বলছি।
তিনি স্বপ্নের মত সত্য ভাষণের কথা বলতেন
সুপ্রাচীন সঙ্গীতের আশ্চর্য ব্যাপ্তির কথা বলতেন
তিনি কবি এবং কবিতার কথা বলতেন।
যখন কবিকে হত্যা করা হল
তখন আমরা নদী এবং সমুদ্রের মোহনার মত
সৌভ্রাত্রে সম্মিলিত হলাম।
প্রজ্জ্বলিত সূর্যের মত অগ্নিগর্ভ হলাম।
ক্ষিপ্রগতি বিদ্যুতের মত
ত্রিভূবন পরিভ্রমণ করলাম।
এবং হিংস্র ঘাতক নতজানু হয়ে
কবিতার কাছে প্রাণভিক্ষা চাইলো।
তখন আমরা দুঃখকে ক্রোধ
এবং ক্রোধকে আনন্দিত করলাম।
নদী এবং সমুদ্রে মোহনার মত
সম্মিলিত কণ্ঠস্বর কবিতা
অবদমিত ক্রোধের আনন্দিত উত্সারণ কবিতা।
যে কবিতা শুনতে জানে না
সে তরঙ্গের সৌহার্দ থেকে বঞ্চিত হবে।
যে কবিতা শুনতে জানে না
নিঃসঙ্গ বিষাদ তাকে অভিশপ্ত করবে।
যে কবিতা শুনতে জানে না
সে মূক ও বধির থেকে যাবে।
আমি কিংবদন্তির কথা বলছি
আমি আমার পূর্বপুরুষের কথা বলছি।
তাঁর পিঠে রক্তজবার মত ক্ষত ছিল
আমি একগুচ্ছ রক্তজবার কথা বলছি।
আমি জলোচ্ছ্বাসের মত
অভ্যুত্থানের কথা বলছি
উতক্ষিপ্ত নক্ষত্রের মত
কমলের চোখের কথা বলছি
প্রস্ফুটিত পুষ্পের মত
সহস্র ক্ষতের কথা বলছি
আমি নিরুদ্দিষ্ট সন্তানের জননীর কথা বলছি
আমি বহমান মৃত্যু
এবং স্বাধীনতার কথা বলছি।
যখন রাজশক্তি আমাদের আঘাত করলো
তখন আমরা প্রাচীণ সঙ্গীতের মত

ঋজু এবং সংহত হলাম।
পর্বত শৃংগের মত
মহাকাশকে স্পর্শ করলাম।
দিকচক্রবালের মত
দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হলাম;
এবং শ্বেত সন্ত্রাসকে
সমূলে উতপাটিত করলাম।
তখন আমরা নক্ষত্রপুঞ্জের মত
উজ্জ্বল এবং প্রশান্ত হলাম।
উতক্ষিপ্ত নক্ষত্রের প্রস্ফুটিত ক্ষতচিহ্ন কবিতা
স্পর্ধিত মধ্যাহ্নের আলোকিত উম্মোচন কবিতা।
যে কবিতা শুনতে জানে না
সে নীলিমাকে স্পর্শ করতে পারে না।
যে কবিতা শুনতে জানে না
সে মধ্যাহ্নের প্রত্যয়ে প্রদীপ্ত হতে পারে না।
যে কবিতা শুনতে জানে না
সে সন্ত্রাসের প্রতিহত করতে পারে না।
আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি
আমি আমার পূর্বপুরুষের কথা বলছি।
আমি শ্রমজীবী মানুষের
উদ্বেল অভিযাত্রার কথা বলছি
আদিবাস অরণ্যের
অনার্য সংহতির কথা বলছি
শৃংখলিত বৃক্ষের
উর্দ্ধমুখী অহংকারের কথা বলছি,
আমি অতীত এবং সমকালের কথা বলছি।
শৃংখলিত বৃক্ষের উর্দ্ধমুখী অহংকার কবিতা
আদিবাস অরণ্যের অনার্য সংহতি কবিতা।
যে কবিতা শুনতে জানে না
যূথভ্রষ্ট বিশৃংখলা তাকে বিপর্যস্ত করবে।
যে কবিতা শুনতে জানে না
বিভ্রান্ত অবক্ষয় তাকে দৃষ্টিহীন করবে।
যে কবিতা শুনতে জানে না
সে আজন্ম হীনমন্য থেকে যাবে।
যখন আমরা নগরীতে প্রবেশ করলাম
তখন চতুর্দিকে ক্ষুধা।
নিঃসঙ্গ মৃত্তিকা শস্যহীন
ফলবতী বৃক্ষরাজি নিস্ফল
এবং ভাসমান ভূখন্ডের মত
ছিন্নমূল মানুষেরা ক্ষুধার্ত।
যখন আমরা নগরীতে প্রবেশ করলাম
তখন আদিগন্ত বিশৃংখলা।
নিরুদ্দিষ্ট সন্তানের জননী শোকসন্তপ্ত
দীর্ঘদেহ পুত্রগণ বিভ্রান্ত
এবং রক্তবর্ণ কমলের মত
বিস্ফোরিত নেত্র দৃষ্টিহীন।
তখন আমরা পূর্বপুরুষকে
স্মরণ করলাম।
প্রপিতামহের বীর গাঁথা
স্মরণ করলাম।
আদিবাসী অরণ্য এবং নতজানু শ্বাপদের কথা
স্মরণ করলাম।
তখন আমরা পর্বতের মত অবিচল
এবং ধ্রুবনক্ষত্রের মত স্থির লক্ষ্য হলাম।
আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি
আমি আমার পূর্বপুরুষের কথা বলছি।
আমি স্থির লক্ষ্য মানুষের
সশস্ত্র অভ্যূত্থানের কথা বলছি
শ্রেণিযুদ্ধের অলিন্দে
ইতিহাসের বিচরণের কথা বলছি
আমি ইতিহাস এবং স্বপ্নের কথা বলছি।
স্বপ্নের মত সত্যভাষণ ইতিহাস
ইতিহাসের আনন্দিত অভিজ্ঞান কবিতা
যে বিনিদ্র সে স্বপ্ন দেখতে পারে না
যে অসুখী সে কবিতা লিখতে পারে না।
যে উদ্গাত অংকুরের মত আনন্দিত

সে কবি
যে সত্যের মত স্বপ্নভাবী
সে কবি
যখন মানুষ মানুষকে ভালবাসবে
তখন প্রত্যেকে কবি।
আমি কিংবদন্তির কথা বলছি
আমি আমার পূর্বপুরুষের কথা বলছি।
আমি বিচলিত বর্তমান
এবং অন্তিম সংগ্রামের কথা বলছি।
খন্ডযুদ্ধের বিরতিতে
আমরা ভূমি কর্ষণ করেছি।
হত্যা এবং ঘাতকের সংকীর্ণ ছায়াপথে
পরিচ্ছন্ন বীজ বপন করেছি।
এবং প্রবহমান নদীর সুকুমার দাক্ষিণ্যে
শস্যের পরিচর্যা করছি।
আমাদের মুখাবয়ব অসুন্দর
কারণ বিকৃতির প্রতি ঘৃণা
মানুষকে কুশ্রী করে দ্যায়।
আমাদের কণ্ঠস্বর রূঢ়
কারণ অন্যায়ের বিরুদ্ধে ক্ষোভ
কণ্ঠকে কর্কশ করে তোলে।
আমাদের পৃষ্ঠদেশে নাক্ষত্রিক ক্ষতচিহ্ন
কারণ উচ্চারিত শব্দ আশ্চর্য বিশ্বাসঘাতক
আমাদেরকে বারবার বধ্যভূমিতে উপনীত করেছে।
আমি কিংবদন্তির কথা বলছি
আমি আমার পূর্বপুরুষের কথা বলছি।
আমার সন্তানেরা
আমি তোমাদের বলছি।
যেদিন প্রতিটি উচ্চারিত শব্দ
সূর্যের মত সত্য হবে
সেই ভবিষ্যতের কথা বলছি,
সেই ভবিষ্যতের কবিতার কথা বলছি।
আমি বিষসর্প প্রভুদের
চির প্রয়াণের কথা বলছি
দ্বন্দ্ব এবং বিরোধের
পরিসমাপ্তির কথা বলছি
সুতীব্র ঘৃণার
চূড়ান্ত অবসানের কথা বলছি।
আমি সুপুরুষ ভালবাসার
সুকণ্ঠ সঙ্গীতের কথা বলছি।
যে কর্ষণ করে
শস্যের সম্ভার তাকে সমৃদ্ধ করবে।
যে মৎস্য লালন করে
প্রবহমান নদী তাকে পুরস্কৃত করবে।
যে গাভীর পরিচর্যা করে
জননীর আশীর্বাদ তাকে দীর্ঘায়ু করবে।
যে লৌহখন্ডকে প্রজ্জ্বলিত করে
ইস্পাতের তরবারি তাকে সশস্ত্র করবে।
দীর্ঘদেহ পুত্রগণ
আমি তোমাদের বলছি।
আমি আমার মায়ের কথা বলছি
বোনের মৃত্যুর কথা বলছি
ভাইয়ের যুদ্ধের কথা বলছি
আমি আমার ভালবাসার কথা বলছি।
আমি কবি এবং কবিতার কথা বলছি।
সশস্ত্র সুন্দরের অনিবার্য অভ্যুত্থান কবিতা
সুপুরুষ ভালবাসার সুকণ্ঠ সঙ্গীত কবিতা
জিহ্বায় উচ্চারিত প্রতিটি মুক্ত শব্দ কবিতা
রক্তজবার মতো প্রতিরোধের উচ্চারণ কবিতা।
আমরা কি তাঁর মত কবিতার কথা বলতে পারবো
আমরা কি তাঁর মত স্বাধীনতার কথা বলতে পারবো?

আর যদি নাই আসো

বিনয় মজুমদার

আর যদি নাই আসো, ফুটন্ত জলের নভোচারী
বাষ্পের সহিত যদি বাতাসের মতো না-ই মেশো,
সেও এক অভিজ্ঞতা; অগণন কুসুমের দেশে
নীল বা নীলাভবর্ণ গোলাপের অভাবের মতো
তোমার অভাব বুঝি; কে জানে হয়তো অবশেষে
বিগলিত হতে পারো; আশ্চর্য দর্শন বহু আছে
নিজের চুলের মৃদু ঘ্রাণের মতন তোমাকেও
হয়তো পাইনা আমি, পূর্ণিমার তিথিতেও দেখি
অস্ফুট লজ্জায় ম্লান ক্ষীণ চন্দ্রকলা উঠে থাকে,
গ্রহণ হবার ফলে, এরূপ দর্শন বহু আছে।

বাতাসে লাশের গন্ধ

রুদ্র মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

আজো আমি বাতাসে লাশের গন্ধ পাই
আজো আমি মাটিতে মৃত্যুর নগ্ননৃত্য দেখি,
ধর্ষিতার কাতর চিৎকার শুনি আজো আমি তন্দ্রার ভেতরে
এ দেশ কি ভুলে গেছে সেই দুঃস্বপ্নের রাত, সেই রক্তাক্ত সময়?
বাতাসে লাশের গন্ধ ভাসে
মাটিতে লেগে আছে রক্তের দাগ।
এই রক্তমাখা মটির ললাট ছুঁয়ে একদিন যারা বুক বেঁধেছিলো।
জীর্ণ জীবনের পুঁজে তারা খুঁজে নেয় নিষিদ্ধ আধাঁর,
আজ তারা আলোহীন খাঁচা ভালোবেসে জেগে থাকে রাত্রির গুহায়।
এ যেন নষ্ট জন্মের লজ্জায় আরষ্ট কুমারী জননী,
স্বাধীনতা একি হবে নষ্ট জন্ম?
একি তবে পিতাহীন জননীর লজ্জার ফসল?

জাতির পতাকা খামচে ধরেছে আজ পুরোনো শকুন।

বাতাশে লাশের গন্ধ
নিয়ন আলোয় তবু নর্তকীর দেহে দুলে মাংসের তুফান।
মাটিতে রক্তের দাগ
চালের গুদামে তবু জমা হয় অনাহারী মানুষের হাড়
এ চোখে ঘুম আসেনা। সারারাত আমার ঘুম আসেনা-
তন্দ্রার ভেতরে আমি শুনি ধর্ষিতার করুণ চিৎকার,
নদীতে পানার মতো ভেসে থাকা মানুষের পচা লাশ
মুন্ডহীন বালিকার কুকুরে খাওয়া বিভৎস্য শরীর
ভেসে ওঠে চোখের ভেতরে। আমি ঘুমুতে পারিনা, আমি
ঘুমুতে পারিনা
রক্তের কাফনে মোড়া কুকুরে খেয়েছে যারে, শকুনে খেয়েছে যারে
সে আমার ভাই, সে আমার মা, সে আমার প্রিয়তম পিতা।
স্বাধীনতা, সে আমার স্বজন, হারিয়ে পাওয়া একমাত্র স্বজন
স্বাধীনতা আমার প্রিয় মানুষের রক্তে কেনা অমূল্য ফসল।
ধর্ষিতা বোনের শাড়ী ওই আমার রক্তাক্ত জাতির পতাকা।

সফদার ডাক্তার
হোসনে আরা

সফদার ডাক্তার
মাথা ভরা টাক তার
খিদে পেলে পানি খায় চিবিয়ে,
চেয়ারেতে রাত দিন
বসে গোণে দুই তিন
পড়ে বই আলোটারে নিভিয়ে।

ইয়া বড় গোফ তার
নাই যার জুড়িদার
শুলে তার ভুড়ি ঠেকে আকাশে,
নুন দিয়ে খায় পান
সারাক্ষণ গায় গান
বুদ্ধিতে অতি বড় পাকা সে।

রোগী এলে ঘর তার
খুশিতে সে চারবার
কষে দেয় ডন আর কুস্তি,
তার পর রোগীটারে
গোটা দুই চাঁটি মারে
যেন তার সাথে কত দুস্তি।

ম্যালেরিয়া হলে কারো
নাহি আর নিস্তার
ধরে তারে কেঁচো দেয় গিলিয়ে,
আমাশয় হলে পরে
দুই হাতে কান ধরে
পেটটারে ঠিক করে কিলিয়ে।

কলেরার রোগী এলে
দুপুরের রোদে ফেলে
দেয় তারে কুইনিন খাইয়ে,
তারপরে দুই টিন
পচা জলে তারপিন
ঢেলে তারে দেয় শুধু নাইয়ে।

ডাক্তার সফদার
নাম ডাক খুব তার
নামে গাও থরথরি কম্প,
নাম শুনে রোগীসব
করে জোরে কলরব
পিঠটান দিয়ে দেয় লম্ফ।

একদিন সককালে
ঘটল কি জঞ্জাল
ডাক্তার ধরে এসে পুলিশে,
হাত-কড়া দিয়ে হাতে
নিয়ে যায় থানাতে
তারিখটা আষাঢ়ের উনিশে।

আমাদের গ্রাম

বন্দে আলী মিয়া

আমাদের ছোট গাঁয়ে ছোট ছোট ঘর,
থাকি সেথা সবে মিলে নাহি কেহ পর
পাড়ার সকল ছেলে মোরা ভাই ভাই,
এক সাথে খেলি আর পাঠশালে যাই
হিংসা ও মারামারি কভু নাহি করি,
পিতামাতা গুরুজনে সদা মোরা ডরি।

আমাদের ছোট গ্রাম মায়ের সমান,
আলো দিয়ে, বায়ু দিয়ে বাঁচাইয়াছে প্রাণ
মাঠ ভরা ধান তার জল ভরা দিঘি,
চাঁদের কিরণ লেগে করে ঝিকিমিকি
আম গাছ, জাম গাছ, বাঁশ ঝাড় যেন,
মিলে মিশে আছে ওরা আত্মীয় হেন
সকালে সোনার রবি পুব দিকে ওঠে,
পাখি ডাকে, বায়ু বয়, নানা ফুল ফোটে

আদর্শ ছেলে

কুসুম কুমারী দাশ

আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে
কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে?
মুখে হাসি, বুকে বল তেজে ভরা মন
মানুষ হইতে হবে-এই তার পণ,
বিপদ আসিলে কাছে হও আগুয়ান,
নাই কি শরীরে তব রক্ত মাংস প্রাণ?
হাত, পা সবারই আছে মিছে কেন ভয়,
চেতনা রয়েছে যার সে কি পড়ে রয়?
সে ছেলে কে চায় বল কথায়-কথায়,
আসে যার চোখে জল মাথা ঘুরে যায়।
সাদা প্রাণে হাসি মুখে কর এই পণ-
মানুষ হইতে হবে মানুষ যখন।
কৃষকের শিশু কিংবা রাজার কুমার
সবারি রয়েছে কাজ এ বিশ্ব মাঝার,
হাতে প্রাণে খাট সবে শক্তি কর দান
তোমরা মানুষ হলে দেশের কল্যাণ।

ফুল ফুটুক না ফুটুক
সুভাষ মুখোপাধ্যায়

ফুল ফুটুক না ফুটুক
আজ বসন্ত।

শান-বাঁধানো ফুটপাথে
পাথরে পা ডুবিয়ে এক কাঠখোট্টা গাছ
কচি কচি পাতায় পাঁজর ফাটিয়ে
হাসছে।

ফুল ফুটুক না ফুটুক
আজ বসন্ত।

আলোর চোখে কালো ঠুলি পরিয়ে
তারপর খুলে-
মৃত্যুর কোলে মানুষকে শুইয়ে দিয়ে
তারপর তুলে-
যে দিনগুলো রাস্তা দিয়ে চলে গেছে
যেন না ফেরে।

গায়ে হলুদ দেওয়া বিকেলে
একটা দুটো পয়সা পেলে
যে হরবোলা ছেলেটা
কোকিল ডাকতে ডাকতে যেত
-তাকে ডেকে নিয়ে গেছে দিনগুলো।

লাল কালিতে ছাপা হলদে চিঠির মত
আকাশটাকে মাথায় নিয়ে
এ-গলির এক কালোকুচ্ছিত আইবুড়ো মেয়ে
রেলিঙে বুক চেপে ধ'রে
এই সব সাত-পাঁচ ভাবছিল-

ঠিক সেই সময়
চোখের মাথা খেয়ে গায়ে উড়ে এসে বসল
আ মরণ! পোড়ারমুখ লক্ষ্মীছাড়া প্রজাপতি!

তারপর দড়াম করে দরজা বন্ধ হবার শব্দ।
অন্ধকারে মুখ চাপা দিয়ে
দড়িপাকানো সেই গাছ
তখনও হাসছে।

স্বাধীনতা, এই শব্দটি কিভাবে আমাদের হলো
নির্মলেন্দু গুণ

একটি কবিতা লেখা হবে তার জন্য অপেক্ষার উত্তেজনা নিয়ে
লক্ষ লক্ষ উন্মত্ত অধীর ব্যাকুল বিদ্রোহী শ্রোতা বসে আছে
ভোর থেকে জনসমুদ্রের উদ্যান সৈকতে-
'কখন আসবে কবি?' 'কখন আসবে কবি?'

এই শিশু পার্ক সেদিন ছিল না,
এই বৃক্ষে- ফুলে শোভিত উদ্যান সেদিন ছিল না,
এই তন্দ্রাচ্ছন্ন বিবর্ণ বিকেল সেদিন ছিল না।
তাহলে কেমন ছিল সেদিনের সেই বিকেল বেলাটি?
তাহলে কেমন ছিল শিশু পার্কে, বেঞ্চে, বৃক্ষে,
ফুলের বাগানে ঢেকে দেয়া এই ঢাকার হৃদয় মাঠখানি?
জানি, সেদিনের সব স্মৃতি মুছে দিতে
হয়েছে উদ্যত কালো হাত।
তাই দেখি কবিহীন এই বিমুখ প্রান্তরে আজ
কবির বিরুদ্ধে কবি,
মাঠের বিরুদ্ধে মাঠ,
বিকেলের বিরুদ্ধে বিকেল,
উদ্যানের বিরুদ্ধে উদ্যান,
মার্চের বিরুদ্ধে মার্চ...।

হে অনাগত শিশু, হে আগামী দিনের কবি,
শিশু পার্কের রঙিন দোলনায় দোল খেতে খেতে তুমি
একদিন সব জানতে পারবে,- আমি তোমাদের কথা ভেবে
লিখে রেখে যাচ্ছি সেই শ্রেষ্ঠ বিকেলের গল্প।

সেদিন এই উদ্যানের রূপ ছিল ভিন্নতর;
না পার্ক না ফুলের বাগান,- এসবের কিছুই ছিল না,
শুধু একখণ্ড অখণ্ড আকাশ যে রকম, সে রকম দিগন্ত প্লাবিত
ধু-ধু মাঠ ছিল দূর্বাদলে ঢাকা, সবুজে সবুজময়।

আমাদের স্বাধীনতাপ্রিয় প্রাণের সবুজ এসে মিশে ছিল
এই ধু-ধু মাঠের সবুজে।

কপালে কব্জিতে লালসালু বেঁধে এই মাঠে ছুটে এসেছিল
কারখানা থেকে লোহার শ্রমিক, লাঙল জোয়াল কাঁধে
এসেছিল ঝাঁক বেঁধে উলঙ্গ কৃষক, পুলিশের অস্ত্র কেড়ে নিয়ে
এসেছিল প্রদীপ্ত যুবক, হাতের মুঠোয় মৃত্যু চোখে স্বপ্ন নিয়ে
এসেছিল মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত, করুণ কেরানী, নারী, বৃদ্ধ, বেশ্যা,
ভবঘুরে আর তোমাদের মতো শিশু পাতা-কুড়ানীরা দল বেঁধে।
একটি কবিতা পড়া হবে তার জন্য সে কী ব্যাকুল প্রতীক্ষা মানুষের।
'কখন আসবে কবি?' 'কখন আসবে কবি?'

শত বছরের শত সংগ্রাম শেষে রবীন্দ্রনাথের মতো দৃপ্ত পায়ে হেঁটে
অতঃপর কবি এসে জনতার মঞ্চে দাঁড়ালেন।
তখন পলকে দারুণ ঝলকে তরীতে উঠিল জল,
হৃদয়ে লাগিল দোলা,
জনসমুদ্রে জাগিল জোয়ার সকল দুয়ার খোলা- ;
কে রোধে তাঁহার বজ্র কণ্ঠ বাণী?
গণসূর্যের মঞ্চ কাঁপিয়ে কবি শুনালেন তাঁর
অমর কবিতাখানি:
'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম,
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'
সেই থেকে 'স্বাধীনতা' শব্দটি আমাদের।

স্বাধীনতার ডাক
রজনীকান্ত সেন

বাবুই পাখিরে ডাকি, বলিছে চড়াই,
"কুঁড়ে ঘরে থেকে কর শিল্পের বড়াই,
আমি থাকি মহাসুখে অট্টালিকা পরে
তুমি কত কষ্ট পাও রোদ, বৃষ্টি, ঝড়ে।"

বাবুই হাসিয়া কহে, "সন্দেহ কি তাই?
কষ্ট পাই, তবু থাকি নিজের বাসায়।
পাকা হোক, তবু ভাই, পরেরও বাসা,
নিজ হাতে গড়া মোর কাঁচা ঘর, খাসা।"

কাজলা দিদি
যতীন্দ্রমোহন বাগচী

বাঁশ বাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ওই,
মাগো আমার শোলক-বলা কাজলা দিদি কই?
পুকুর ধারে লেবুর তলে থোকায় থোকায় জোনাক জ্বলে
ফুলের গন্ধে ঘুম আসে না একলা জেগে রই-
মাগো আমার কোলের কাছে কাজলা দিদি কই?
সেদিন হতে কেন মা আর দিদিরে না ডাকো;-
দিদির কথায় আঁচল দিয়ে মুখটি কেন ঢাকো?
খাবার খেতে আসি যখন, দিদি বলে ডাকি তখন,
ও ঘর থেকে কেন মা আর দিদি আসে নাকো?

আমি ডাকি তুমি কেন চুপটি করে থাকো?
বল মা দিদি কোথায় গেছে, আসবে আবার কবে?
কাল যে আমার নতুন ঘরে পুতুল-বিয়ে হবে!
দিদির মত ফাঁকি দিয়ে, আমিও যদি লুকাই গিয়ে
তুমি তখন একলা ঘরে কেমন করে রবে,
আমিও নাই-দিদিও নাই- কেমন মজা হবে।
ভুঁই চাপাতে ভরে গেছে শিউলি গাছের তল,
মাড়াস্ নে মা পুকুর থেকে আনবি যখন জল।
ডালিম গাছের ফাঁকে ফাঁকে বুলবুলিটি লুকিয়ে থাকে,
উড়িয়ে তুমি দিও না মা, ছিঁড়তে গিয়ে ফল,-
দিদি এসে শুনবে যখন, বলবি কি মা বল!
বাঁশ বাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ওই-
এমন সময় মাগো আমার কাজলা দিদি কই?
লেবুর ধারে পুকুর পাড়ে ঝিঁঝিঁ ডাকে ঝোপে ঝাড়ে
ফুলের গন্ধে ঘুম আসে না, তাইতো জেগে রই
রাত্রি হলো মাগো আমার কাজলা দিদি কই?

মাতৃভাষা
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

মায়ের কোলেতে শুয়ে উরুতে মস্তক থুয়ে
খল খল সহাস্য বদন।
অধরে অমৃত ক্ষরে আধ আধ মৃদু স্বরে
আধ আধ বচনরচন।।
কহিতে অন্তরে আশা মুখে নাহি কটু ভাষা
ব্যাকুল হয়েছে কত তায়।
মা-ম্মা-মা-মা-বা-ব্বা-বা-বা আবো আবো আবা আবা
সমুদয় দেববাণী প্রায়।।
ক্রমেতে ফুটিল মুখ উঠিল মনের সুখ
একে একে দেখিলে সকল।
মেসো, পিসে, খুড়ো, বাপ জুজু, ভুত, ছুঁচো, সাপ
স্থল জল আকাশ অনল।।
ভাল মন্দ জানিতে না, মল মুত্র মানিতে না,
উপদেশ শিক্ষা হল যত।
পঞ্চমেতে হাতে খড়ি, খাইয়া গুরুর ছড়ি,
পাঠশালে পড়িয়াছ কত।।
যৌবনের আগমনে, জ্ঞানের প্রতিভা সনে,
বস্তুবোধ হইল তোমার।
পুস্তক করিয়া পাঠ, দেখিয়া ভবের নাট,
হিতাহিত করিছ বিচার।।
যে ভাষায় হয়ে প্রীত পরমেশ-গুণ-গীত
বৃদ্ধকালে গান কর মুখে।
মাতৃসম মাতৃভাষা পুরালে তোমার আশা
তুমি তার সেবা কর সুখে।।

সবার আমি ছাত্র
সুনির্মল বসু

আকাশ আমায় শিক্ষা দিল
উদার হাতে ভাইরে,
কর্মী হবার মন্ত্র আমি
বায়ুর কাছে পাই রে।

পাহাড় শিখায় তাহার সমান-
হই যেন ভাই মৌন-মহান,
খোলা মাঠের উপদেশে-
দিল-খোলা হই তাই রে।

সূর্য আমায় মন্ত্রণা দেয়
আপন তেজে জ্বলতে,
চাঁদ শিখাল হাসতে মোরে,
মধুর কথা বলতে।

ইঙ্গিতে তার শিখায় সাগর-
অন্তর হোক রত্ন-আকর,
নদীর কাছে শিক্ষা পেলাম
আপন বেগে চলতে।

মাটির কাছে সহিষ্ণুতা
পেলাম আমি শিক্ষা,
আপন কাজে কঠোর হতে
পাষান দিল দীক্ষা।

ঝরনা তাহার সহজ গানে,
গান জাগাল আমার প্রাণে,
শ্যাম বনানী সরসতা
আমায় দিল ভিক্ষা।

বিশ্বজোড়ে পাঠশালা মোর,
সবার আমি ছাত্র,
নানান ভাবে নতুন জিনিস
শিখছি দিবারাত্র।

এই পৃথিবীর বিরাট খাতায়,
পাঠ্য যেসব পাতায় পাতায়
শিখছি সে সব কৌতুহলে,
নেই দ্বিধা লেশমাত্র।

আমার পণ

মদনমোহন তর্কালঙ্কার

সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি,
সারাদিন আমি যেন ভাল হয়ে চলি।
আদেশ করেন যাহা মোর গুরুজনে,
আমি যেন সেই কাজ করি ভাল মনে।
ভাইবোন সকলেরে যেন ভালবাসি,
এক সাথে থাকি যেন সবে মিলেমিশি।
ভাল ছেলেদের সাথে মিশে করি খেলা,
পাঠের সময় যেন নাহি করি হেলা।
সুখী যেন নাহি হই আর কারো দুখে,
মিছে কথা কভু যেন নাহি আসে মুখে।
সাবধানে যেন লোভ সামলিয়ে থাকি,
কিছুতে কাহারে যেন নাহি দেই ফাঁকি।
ঝগড়া না করি যেন কভু কারো সনে,
সকালে উঠিয়া এই বলি মনে মনে।

স্বর্গ ও নরক
শেখ ফজলুল করিম

কোথায় স্বর্গ, কোথায় নরক, কে বলে তা বহুদূর?
মানুষেরি মাঝে স্বর্গ নরক, মানুষেতে সুরাসুর!
রিপুর তাড়নে যখনই মোদের বিবেক পায় গো লয়,
আত্মগ্লানির নরক-অনলে তখনি পুড়িতে হয়।
প্রীতি ও প্রেমের পুণ্য বাঁধনে যবে মিলি পরস্পরে,
স্বর্গ আসিয়া দাঁড়ায় তখন আমাদেরি কুঁড়ে ঘরে।

খুকু ও খোকা
অন্নদাশঙ্কর রায়

তেলের শিশি ভাঙল বলে
খুকুর পরে রাগ করো
তোমরা যে সব বুড়ো খোকা
ভারত ভেঙে ভাগ করো!
তার বেলা?

ভাঙছ প্রদেশ ভাঙছ জেলা
জমিজমা ঘরবাড়ী
পাটের আড়ৎ ধানের গোলা
কারখানা আর রেলগাড়ী!
তার বেলা?

চায়ের বাগান কয়লাখনি
কলেজ থানা আপিস-ঘর
চেয়ার টেবিল দেয়ালঘড়ি
পিয়ন পুলিশ প্রোফেসর!
তার বেলা?

যুদ্ধ জাহাজ জঙ্গী মোটর
কামান বিমান অশ্ব উট
ভাগাভাগির ভাঙাভাঙির
চলছে যেন হরির-লুট!
তার বেলা?

তেলের শিশি ভাঙল বলে
খুকুর পরে রাগ করো
তোমরা যে সব বুড়ো খোকা
বাঙলা ভেঙে ভাগ করো!
তার বেলা?

ধন ধান্য পুষ্প ভরা
দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

ধন ধান্য পুষ্প ভরা, আমাদের এই বসুন্ধরা,
তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা,
ও সে স্বপ্ন দিয়ে তৈরী সে দেশ স্মৃতি দিয়ে ঘেরা।
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি,
সকল দেশের রানী সে যে আমার জন্মভূমি।

চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা, কোথায় উজান এমন ধারা,
কোথায় এমন খেলে তড়িৎ, এমন কালো মেঘে,
তার পাখির ডাকে ঘুমিয়ে পড়ে পাখির ডাকে জেগে।
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি,
সকল দেশের রানী সেযে আমার জন্মভূমি।

এতো স্নিগ্ধ নদী কাহার, কোথায় এমন ধূম্র পাহাড়,
কোথায় এমন হরিৎক্ষেত্র আকাশ তলে মিশে।
এমন ধানের উপর ঢেউ খেলে যায়, বাতাস কাহার দেশে।
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি,
সকল দেশের রানী সে যে আমার জন্মভূমি।

পুষ্পে পুষ্পে ভরা শাখী, কুঞ্জে কুঞ্জে গাহে পাখি,
গুঞ্জরিয়া আসে অলি, পুঞ্জে পুঞ্জে ধেয়ে,
তারা ফুলের উপর ঘুমিয়ে পড়ে ফুলের মধু খেয়ে।
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি,
সকল দেশের রানী সেযে আমার জন্মভূমি।

ভায়ের মায়ের এতো স্নেহ, কোথায় গেলে পাবে কেহ!
ও মা তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমার ধরি,
আমার এই দেশেতে জন্ম- যেন এই দেশেতে মরি
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি,
সকল দেশের রানী সে যে আমার জন্মভূমি।

ভাত দে হারামজাদা
রফিক আজাদ

ভীষণ ক্ষুধার্ত আছিঃ উদরে, শরীরবৃত্ত ব্যেপে
অনুভূত হতে থাকে প্রতিপলে সর্বগ্রাসী ক্ষুধা!
অনাবৃষ্টি- যেমন চৈত্রের শস্যক্ষেত্রে- জ্বেলে দ্যায়
প্রভুত দাহন তেমনি ক্ষুধার জ্বালা, জ্বলে দেহ

দু'বেলা দু'মুঠো পেলে মোটে নেই অন্য কোনো দাবী,
অনেকে অনেক কিছু চেয়ে নিচ্ছে, সকলেই চায়ঃ
বাড়ি, গাড়ি, টাকা কড়ি কারো বা খ্যাতির লোভ আছে;
আমার সামান্য দাবী পুড়ে যাচ্ছে পেটের প্রান্তর
ভাত চাইএই চাওয়া সরাসরি ঠান্ডা বা গরম,
সরু বা দারুণ মোটা রেশনের লাল চালে হ'লে
কোনো ক্ষতি নেই- মাটির শানকি ভর্তি ভাত চাই;
দু'বেলা দু'মুঠো পেলে ছেড়ে দেবো অন্য-সব দাবী।

অযৌক্তিক লোভ নেই, এমনকি নেই যৌনক্ষুধা
চাই নি তোঃ নাভি নিম্নে-পরা শাড়ি, শাড়ির মালিক;
যে চায় সে নিয়ে যাক- যাকে ইচ্ছা তাকে দিয়ে দাও
জেনে রাখোঃ আমার ওসবের কোনো প্রয়োজন নেই।
যদি না মেটাতে পারো আমার সামান্য এই দাবী,
তোমার সমস্ত রাজ্যে দক্ষযজ্ঞ কাণ্ড ঘ'টে যাবে;
ক্ষুধার্তের কাছে নেই ইষ্টানিষ্ট, আইন কানুন
সম্মুখে যা কিছু পাবো খেয়ে যাবো অবলীলাক্রমেঃ
থাকবে না কিছু বাকি- চলে যাবে হা-ভাতের গ্রাসে।
যদি বা দৈবাৎ সম্মুখে তোমাকে, ধরো, পেয়ে যাই
রাক্ষুসে ক্ষুধার কাছে উপাদেয় উপাচার হবে।
সর্বপরিবেশগ্রাসী হ'লে সামান্য ভাতের ক্ষুধা
ভয়াবহ পরিণতি নিয়ে আসে নিমন্ত্রণ করে।
দৃশ্য থেকে দ্রষ্টা অব্দি ধারাবাহিকতা খেয়ে ফেলে
অবশেষে যথাক্রমে খাবোঃ গাছপালা, নদী-নালা,

গ্রাম-গঞ্জ, ফুটপাত, নর্দমার জলের প্রপাত,
চলাচলকারী পথচারী, নিতম্ব-প্রধান নারী
উড্ডীন পতাকাসহ খাদ্যমন্ত্রী ও মন্ত্রীর গাড়ি
আমার ক্ষুধার কাছে কিছুই ফেলনা নয় আজ।
ভাত দে হারামজাদা, তা না-হ'লে মানচিত্র খাবো।

তালেব মাস্টার

আশরাফ সিদ্দিকী

তালসোনাপুরের তালেব মাস্টার আমিঃ
আজ থেকে আরম্ভ করে চল্লিশ বছর দিবসযামী
যদিও করছি লেন নয় শিক্ষার দেন
(মাফ করবেন। নাম শুনেই চিনবেন)
এমন কথা কেমন করে বলি।
তবুও যখন ঝাড়তে বসি স্মৃতির থলি
মনে পড়ে অনেক অনেক কচি মুখ, চপল চোখঃ
শুনুনঃ গর্বের সাথেই বলিঃ
তাদের ভেতর অনেকেই এখন বিখ্যাত লোক।
গ্রাম্য পাঠশালার দরিদ্র তালেব মাস্টারকে
না চিনতে পারেন। কিন্তু তাদেরকে
নাম শুনেই চিনবেন।
(মুনাজাত করিঃ খোদা তাদের আরও বড় করেন।)
অনেক বয়স হয়ে গিয়েছে আমার
পিঠ বেঁকে গিয়েছে আর
চোখেও ভালো দেখি না তেমন
তাই ভাবছিঃ সময় থাকতে থাকতে এখন
আত্মকাহিনিটা লিখে যাবো আমার।
রবিবাবু থেকে আরম্ভ করে আজকের তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়
আরও কত সাহেব, চট্টোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায়, রায়,
কত কাহিনিই তো আপনারা লিখে গেলেন!
কিন্তু মানিকবাবু! আপনি কি এমন একটি কাহিনি শুনেছেনঃ
কোথাও রোমাঞ্চ নেই। খাঁটি করুণ বাস্তবতা-
এবং এই বাংলাদেশেরই কথা।
নমস্কার
আমি সেই তালসোনাপুরের তালেব মাস্টার।
আরম্ভটা খুবই সাধারণ! কারণ
রক্তস্নানে শুভ্র হয়ে সত্তর বছর পূর্বে যখন
প্রথম আলো দেখলাম, হাসলাম এবং
বাড়লাম

তখন থেকেই ট্রাজিডি চলছে অবিরাম !
লেখাপড়ায় যদিও খুব ভাল ছাত্র ছিলাম
অষ্টম শ্রেণিতে উঠেই বন্ধ করে দিতে হল
কারণ -
পিতা - মাতার সংসারে নিদারুণ অনটন !
জমিদার সাহেবের কৃপায় চাকুরি জুটে গেল
একখানা
ডজন খানেক ছেলেমেয়ে পড়ানো ; মাসিক
বেতন তিন টাকা আট আনা!
(তাদের ভেতর একজন এখন ব্যারিস্টার!
জানিনা তালেব মাস্টারকে মনে আছে
কিনা তার!)

পাঠশালা খুলেছি তারপর
সুদীর্ঘ দিন ধরে বহু ঝঞ্ঝা ঝড়
বয়ে গেছে। ভুলেছি-
অক্লান্তভাবেই জ্ঞানের প্রদীপ জ্বেলেছি।
পানির মত বছর কেটে গেল
কত ছাত্র গেল, এল-
প্রমোশন পেল
কিন্তু দশ টাকার বেশী প্রমোশন হয়নি
আমার!
কপালে করাঘাত করেছিলাম জীবনে প্রথম
সেবার
যখন টাকার অভাবে একটি মাত্র ছেলের
লেখাপড়া বন্ধ হল।
আক্রার বাজার। চাল-নুনেই কাবার!
কী-ই বা করার ছিল আমার!
ঘরে বৃদ্ধ মা বাপ
পুরাতন জ্বরে ভুগে ভুগে তারাও যখন ছাড়ল
শেষ হাঁপ
দুঃখ করে শুধু খোদাকে বলেছিলাম একবার:
এতো দরিদ্র এই তালেব মাস্টার!

তবু ছাত্রদের বুঝাই প্রাণপণ :
'সকল ধনের সার বিদ্যা মহাধন'!
দেশে আসলো কংগ্রেস, স্বদেশী আন্দোলন
খিলাফতের ঝড় বইছে, এলোমেলো
খড়ো ঘরে ছাত্র পড়াই আর ভাবি : এই
সুদিন এল !
মন দিয়ে বুঝাই পলাশীর যুদ্ধ,
জালিয়ানওয়ালার হত্যা
হযরত মোহাম্মদ, রাম-লক্ষণ আর বাদশা
সোলেমানের কথা
গুন্ গুন্ করে গান গাই : 'একবার বিদায় দাও
মা গো ঘুরে আসি
অভিরামের হয় দ্বীপান্তর ক্ষুদিরামের হয় -
মা গো ফাঁসি' !
আসলো মোস্লেম লীগ, কম্যুনিস্ট বন্ধু
সকলের কথাই ভাল লাগে : ভাবি এরাও বুঝি
দেশের বন্ধু !
কোথায় শুনি ঝগড়া লেগেছে।
আগুন জ্বলেছে জ্বলুক ! ওরা-
তবু'ত জেগেছে! ভায়ে ভায়ে ঝগড়া কদিন
থাকে !
নিভবেই! বলি :
লেজে যদি তোদের আগুন লেগেই থাকে
তবে শত্রুর
স্বর্ণ- লঙ্কাই পোড়া !
ছেলেটি কাজ করে মহাজনী দোকানে
মাসিক পাঁচ টাকা বেতন। প্রাণে
তবুও বেঁচে আছি আসলো পঞ্চাশ সাল
ঘরে- বাইরে হাটে-বাটে আকাল। ঘোর
আকাল !
একশো টাকা চালের মণ- পঞ্চাশ হায়
পঞ্চাশ !
ঘরে বাইরে দিনের পর দিন উপাস হায়

উপাস!
গ্রামের পর গ্রাম কাল- কলেরায় উজাড় !
নিরীহ তালেব মাস্টারের বুকেও বজ্র
পড়লো ! কলেরায়
ছেলেটি মারা গেল বিনা পথ্য বিনা
শুশ্রূষায় !
কাফনের কাপড় জোটেনি তাই বিনা
কাফনে
বাইশ বছরের বুকের মানিককে কবরে শুইয়ে
দিয়েছি
এখানে !
এ-ই শেষ নয় -শুনেন : বলি :
মেয়েটাকে বিয়ে দিয়েছিলাম পলাশতলী
সেখানেও আকাল ! মানুষে মানুষ খায় ।
তিন দিনের উপবাসী আর লজ্জা বস্ত্রহীন
হয়ে নিদারুণ ব্যথায়
দড়ি কলসী বেঁধে পুকুরের জলে ডুবে মরেছিল
একদিন সন্ধ্যায়।

মানিকবাবু, আমি জানি : প্রাণবান
লেখনী আপনার
তালেব মাস্টারের সাথে হয়ত আপনিও অশ্রু
ফেলছেন বেদনার।
কিন্তু আশ্চর্য ! আজও বেঁচে আছি আমি
এবং অক্লান্তভাবে দিবসযামী
তালসোনাপুরের প্রাইমারী পাঠশালায়
বিলাই জ্ঞানালোক:
ছাত্রদের পড়াই ' ধৈর্য্য ধরো, ধৈর্য্য ধরো
বাঁধ বাঁধ বুক
যত দিকে যত দুঃখ আসুক আসুক ...'।

শুভাকাঙ্ক্ষীরা সকলে আমায় বলে 'বোকা
মাস্টার'
কারণ ঘরের খেয়ে যে বনের মোষ তাড়ায়
তা ছাড়া
সে কি আর !
যুদ্ধ থেমে গেছে । আমরা তো এখন স্বাধীন।
কিন্তু তালেব মাস্টারের তবু ফিরল না তো
দিন !
স্ত্রী ছয় মাস অসুস্থ্য
আমারও সময় হয়ে এসেছে : এই তো শরীরের
অবস্থা !
পাঁচ মাস হয়ে গেছে : শিক্ষা বোর্ডের
বিল নাই ।
হয়ত এ - বারের টাকা আস্তে আস্তে শেষ
হবে আয়ু তাই
শতছিন্ন জামাটা কাঁধে ফেলে এখনো
পাঠশালায় যাই
ক্ষীণ কণ্ঠে পড়াই:
'হে মোর চিত্ত পুণ্য তীর্থে জাগোরে ধীরে
এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে...
মনে মনে বলি :
যদিই ফোটে একদিন আমার এইসব সূর্যমুখীর
কলি!

ইতিহাস সবই লিখে রেখেছে । রাখবে-
কিন্তু এই তালেব মাস্টারের কথা কি লেখা
থাকবে?
আমি যেন সেই হতভাগ্য বাতিওয়ালা
আলো দিয়ে বেড়াই পথে পথে কিন্তু
নিজের জীবনই অন্ধকারমালা ।
মানিকবাবু ! অনেক বই পড়েছি আপনার
পদ্মানদীর মাঝির ব্যথায় আমিও কেঁদেছি
বহুবার।
খোদার কাছে মুনাজাত করি : তিনি
আপনাকে দীর্ঘজীবী করুণ

আমার অনুরোধ: আপনি আরও একটা বই লিখুন
আপনার সমস্ত দরদ দিয়ে তাকে তুলে ধরুন
আ-র, আমাকেই তার নায়ক করুণ !
কোথাও রোমান্স নেই! খাঁটি করুণ বাস্তবতা-
এবং এই বাংলা দেশের কথা।

মনে থাকবে?

আরণ্যক বসু

পরের জন্মে বয়স যখন ষোলোই সঠিক
আমরা তখন প্রেমে পড়বো
মনে থাকবে?
বুকের মধ্যে মস্তো বড় ছাদ থাকবে
শীতলপাটি বিছিয়ে দেব;
সন্ধ্যে হলে বসবো দু'জন।
একটা দুটো খসবে তারা
হঠাৎ তোমার চোখের পাতায় তারার চোখের জল গড়াবে,
কান্ত কবির গান গাইবে
তখন আমি চুপটি ক'রে দুচোখ ভ'রে থাকবো চেয়ে
মনে থাকবে?
এই জন্মের দূরত্বটা পরের জন্মে চুকিয়ে দেব
এই জন্মের চুলের গন্ধ পরের জন্মে থাকে যেন
এই জন্মের মাতাল চাওয়া পরের জন্মে থাকে যেন
মনে থাকবে?
আমি হবো উড়নচন্ডি
এবং খানিক উস্কোখুস্কো
এই জন্মের পারিপাট্য সবার আগে ঘুচিয়ে দেব
তুমি কাঁদলে গভীর সুখে
এক নিমেষে সবটুকু জল শুষে নেব
মনে থাকবে?
পরের জন্মে কবি হবো
তোমায় নিয়ে হাজারখানেক গান বাঁধবো।
তোমার অমন ওষ্ঠ নিয়ে
নাকছাবি আর নূপুর নিয়ে
গান বানিয়ে
মেলায় মেলায় বাউল হয়ে ঘুরে বেড়াবো
মনে থাকবে?

একবার তুমি
শক্তি চট্টোপাধ্যায়

একবার তুমি ভালোবাসতে চেষ্টা করো
দেখবে, নদির ভিতরে, মাছের বুক থেকে পাথর
ঝরে পড়ছে
পাথর পাথর পাথর আর নদী-সমুদ্রের জল
নীল পাথর লাল হচ্ছে, লাল পাথর নীল
একবার তুমি ভালোবাসতে চেষ্টা করো ।

বুকের ভেতর কিছু পাথর থাকা ভালো- ধ্বনি দিলে
প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়
সমস্ত পায়ে-হাঁটা পথই যখন পিচ্ছিল, তখন ওই
পাথরের পাল একের পর এক বিছিয়ে
যেন কবিতার নগ্ন ব্যবহার , যেন ঢেউ,
যেন কুমোরটুলির সালমা-চুমকি- জরি-মাখা প্রতিমা
বহুদূর হেমন্তের পাঁশুটে নক্ষত্রের দরোজা পর্যন্ত
দেখে আসতে পারি ।

বুকের ভেতরে কিছু পাথর থাকা ভাল
চিঠি-পত্রের বাক্স বলতে তো কিছু- নেই পাথরের ফাঁক
ফোকরে রেখে এলেই কাজ হাসিল-
অনেক সময়তো ঘর গড়তেও মন চায় ।

মাছের বুকের পাথর ক্রমেই আমাদের বুকে এসে
জায়গা করে নিচ্ছে
আমাদের সবই দরকার । আমরা ঘরবাড়ি
গড়বো সভ্যতার একটা স্থায়ী স্তম্ভ তুলে ধরবো
রূপোলি মাছ পাথর ঝরাতে ঝরাতে চলে গেলে
একবার তুমি ভালবাসতে চেষ্টা করো ।

জলহাওয়ার লেখা
জয় গোস্বামী

স্নেহসবুজ দিন
তোমার কাছে ঋণ

বৃষ্টিভেজা ভোর
মুখ দেখেছি তোর

মুখের পাশে আলো
ও মেয়ে তুই ভালো

আলোর পাশে আকাশ
আমার দিকে তাকা-

তাকাই যদি চোখ
একটি দীঘি হোক

যে-দীঘি জ্যোৎস্নায়
হরিণ হয়ে যায়

হরিণদের কথা
জানুক নীরবতা-

নীরব কোথায় থাকে
জলের বাঁকে বাঁকে

জলের দোষ? নাতো!
হাওয়ায় হাত পাতো!

হাওয়ার খেলা? সেকি!

মাটির থেকে দেখি!

মাটিরই গুণ? হবে!
কাছে আসুক তবে!

কাছে কোথায়? দূর!
নদী সমুদ্দুর

সমুদ্র তো নোনা
ছুঁয়েও দেখবো না

ছুঁতে পারিস নদী
শুকিয়ে যায় যদি?

শুকিয়ে গেলে বালি
বালিতে জল ঢালি

সেই জলের ধারা
ভাসিয়ে নেবে পাড়া

পাড়ার পরে গ্রাম
বেড়াতে গেছিলাম

গ্রামের কাছে কাছে
নদীই শুইয়ে আছে

নদীর নিচে সোনা
ঝিকোয় বালুকণা

সোনা খুঁজতে এসে
ডুবে মরবি শেষে

বেশ, ডুবিয়ে দিক

ভেসে উঠবো ঠিক

ভেসে কোথায় যাবো?
নতুন ডানা পাবো

নামটি দেবো তার
সোনার ধান, আর

বলবোঃ শোন, এই
কষ্ট দিতে নেই

আছে নতুন হাওয়া
তোমার কাছে যাওয়া

আরো সহজ হবে
কত সহজ হবে

ভালোবাসবে তবে? বলো
কবে ভালোবাসবে?

নিষিদ্ধ সম্পাদকীয়
হেলাল হাফিজ

এখন যৌবন যার মিছিলে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়
এখন যৌবন যার যুদ্ধে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়
মিছিলের সব হাত
কণ্ঠ
পা এক নয় ।

সেখানে সংসারী থাকে, সংসার বিরাগী থাকে,
কেউ আসে রাজপথে সাজাতে সংসার ।
কেউ আসে জ্বালিয়ে বা জ্বালাতে সংসার
শাশ্বত শান্তির যারা তারাও যুদ্ধে আসে
অবশ্য আসতে হয় মাঝে মধ্যে
অস্তিত্বের প্রগাঢ় আহ্বানে,
কেউ আবার যুদ্ধবাজ হয়ে যায় মোহরের প্রিয় প্রলোভনে
কোনো কোনো প্রেম আছে প্রেমিককে খুনী হতে হয় ।

যদি কেউ ভালোবেসে খুনী হতে চান
তাই হয়ে যান
উৎকৃষ্ট সময় কিন্তু আজ বয়ে যায় ।

এখন যৌবন যার মিছিলে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়
এখন যৌবন যার যুদ্ধে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময় ।

তুই কি আমার দুঃখ হবি
আনিসুল হক

তুই কি আমার দুঃখ হবি?

এই আমি এক উড়নচন্ডী আউলা বাউল
রুখো চুলে পথের ধুলো
চোখের নীচে কালো ছায়া।
সেইখানে তুই রাত বিরেতে স্পর্শ দিবি।
তুই কি আমার দুঃখ হবি?

তুই কি আমার শুষ্ক চোখে অশ্রু হবি?
মধ্যরাতে বেজে ওঠা টেলিফোনের ধ্বনি হবি?
তুই কি আমার খাঁ খাঁ দুপুর
নির্জনতা ভেঙে দিয়ে
ডাকপিয়নের নিষ্ঠ হাতে
ক্রমাগত নড়তে থাকা দরজাময় কড়া হবি?
একটি নীলাভ এনভেলাপে পুরে রাখা
কেমন যেন বিষাদ হবি।

তুই কি আমার শূন্য বুকে
দীর্ঘশ্বাসের বকুল হবি?
নরম হাতের ছোঁয়া হবি?
একটুখানি কষ্ট দিবি।
নিজের ঠোঁট কামড়ে ধরা রোদন হবি?
একটুখানি কষ্ট দিবি।
প্রতীক্ষার এই দীর্ঘ হলুদ বিকেল বেলায়
কথা দিয়েও না রাখা এক কথা হবি?
একটুখানি কষ্ট দিবি।
তুই কি একা আমার হবি?
তুই কি আমার একান্ত এক দুঃখ হবি?

ভালোবাসার কবিতা লিখবো না
আবুল হাসান

'তোমাকে ভালোবাসি তাই ভালোবাসার কবিতা লিখিনি।
আমার ভালোবাসা ছাড়া আর কোনো কবিতা সফল হয়নি,
আমার এক ফোঁটা হাহাকার থেকে
এক লক্ষ কোটি ভালোবাসার কবিতার জন্ম হয়েছে।

আমার একাকীত্বের এক শতাংশ হাতে নিয়ে তুমি
আমার ভালোবাসার মুকুট পরেছো মাথায়!
আমাকে শোষণের নামে তৈরি করেছো আত্মরক্ষার
মৃন্ময়ী যৌবন।
বলো বলো হে ম্লান মেয়ে, এতো স্পর্ধা কেন তোমার?

ভালোবাসার ঔরসে আমার জন্ম!
অহংকার আমার জননী!
তুমি আমার কাছে নতজানু হও,
তুমি ছাড়া আমি আর কোনো ভূগোল জানি না,
আর কোনো ইতিহাস কোথাও পড়িনি!

আমার একা থাকার পাশে তোমার একাকার হাহাকার নিয়ে দাঁড়াও!
হে মেয়ে ম্লান মেয়ে তুমি তোমার হাহাকার নিয়ে দাঁড়াও!
আমার অপার করুণার মধ্যে তোমারও বিস্তৃতি!
তুমি কোন দুঃসাহসে তবে আমার স্বীকৃতি চাও,
হে ম্লান মেয়ে আমার স্বীকৃতি চাও কেন?
তোমার মূর্খতা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধে,
পৃথিবীটা পুড়ে যাবে হেলেনের গ্রীস হবে পুনর্বার আমার কবিতা!
এই ভয়ে প্রতিশোধস্পৃহায়
আজো আমি ভালোবাসার কবিতা লিখিনি
কোনোদিন ভালোবাসার কবিতা লিখিনি।
হে মেয়ে হে ম্লান মেয়ে তোমাকে ভালোবাসি
তাই ভালোবাসার কবিতা আমি কোনোদিন কখনো
লিখবো না!'

ছবি
আবু হেনা মোস্তফা কামাল

আপনাদের সবার জন্যে এই উদার আমন্ত্রণ
ছবির মতো এই দেশে একবার বেড়িয়ে যান।
অবশ্য উল্লেখযোগ্য তেমন কোনো মনোহারী স্পট আমাদের নেই,
কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না- আপনাদের স্ফীত সঞ্চয় থেকে
উপচে পড়া ডলার, মার্ক কিংবা স্টার্লিঙের বিনিময়ে যা পাবেন
ডালাস অথবা মেম্ফিস অথবা ক্যালিফোর্নিয়া তার তুলনায় শিশুতোষ!

আসুন, ছবির মতো এই দেশে বেড়িয়ে যান
রঙের এমন ব্যবহার বিষয়ের এমন তীব্রতা
আপনি কোনো শিল্পীর কাজে পাবেন না, বস্তুত শিল্প মানেই নকল
নয় কি?

অথচ দেখুন, এই বিশাল ছবির জন্যে ব্যবহৃত সব উপকরণ
অকৃত্রিম;
আপনাকে আরো খুলে বলি; এটা, অর্থাৎ আমাদের এই দেশ,
এবং আমি যার পর্যটন দপ্তরের অন্যতম প্রধান, আপনাদের খুলেই বলি,
সম্পূর্ণ নতুন একটি ছবির মতো করে
সম্প্রতি সাজানো হয়েছে।

খাঁটি আর্যবংশসম্ভূত শিল্পীর কঠোর তত্ত্বাবধানে ত্রিশ লক্ষ কারিগর
দীর্ঘ ন'টি মাস দিনরাত পরিশ্রম করে বানিয়েছেন এই ছবি।
এখনো অনেক জায়গায় রং কাঁচা- কিন্তু কী আশ্চর্য গাঢ় দেখেছেন?
ভ্যান গগ্- যিনি আকাশ থেকে নীল আর শস্য থেকে
সোনালী তুলে এনে
ব্যবহার করতেন কখনো, শপথ করে বলতে পারি,
এমন গাঢ়তা দেখেন নি!

আর দেখুন, এই যে নরমুন্ডের ক্রমাগত ব্যবহার- ওর ভেতরেও
একটা গভীর সাজেশান আছে- আসলে ওটাই এই ছবির অর্থাৎ
এই ছবির মতো দেশের- থিম্ ।

রাষ্ট্রপ্রধান কি মেনে নেবেন?

শহীদ কাদরী

চেয়ার, টেবিল, সোফাসেট, আলমারিগুলো আমার নয়
গাছ, পুকুর, জল, বৃষ্টিধারা শুধু আমার
চুল, চিবুক, স্তন, ঊরু আমার নয়,
প্রেমিকের ব্যাকুল অবয়বগুলো আমার

রাষ্ট্রপ্রধান কি মেনে নেবেন আমার প্রস্তাবগুলো
কবিতার লাবণ্য দিয়ে নিজস্ব প্রাধান্য বিস্তার
অন্তিমে উদ্দেশ্য যার?

কুচকাওয়াজ, কামান কিম্বা সামরিক সালাম নয়
বাগানগুলো শুধু আমার
মন্ত্রী, উপমন্ত্রী, আন্তর্জাতিক সাহায্য তহবিল নয়
মিল-অমিলের স্বরবর্ণগুলো শুধু আমার

রাষ্ট্রপ্রধান কি মেনে নেবেন আমার প্রস্তাবগুলো
পররাষ্ট্রনীতির বদলে প্রেম, মন্ত্রীর বদলে কবি
মাইক্রোফোনের বদলে বিহ্বল বকুলের ঘ্রাণ?

টেলিফোন নয়, রেডিও নয়, সংবাদপত্র নয়
গানের রেকর্ডগুলো আমার
ডিক্টেশন নয়, সেক্রেটারি নয়, শর্টহ্যান্ড নয়
রবীন্দ্রনাথের পোর্টেটগুলো আমার

রাষ্ট্রপ্রধান কি মেনে নেবেন আমার প্রস্তাবগুলো
জেনারেলদের হুকুম দেবেন রবীন্দ্রচর্চার? মন্ত্রীদের
কিনে দেবেন সোনালি গীটার? ব্যাঙ্কারদের
বানিয়ে দেবেন কবিতার নিপুণ সমঝদার?

রাষ্ট্রপ্রধান কি মেনে নেবেন আমার প্রস্তাবগুলো?

গীতবিতান ছাড়া কিছু রপ্তানি করা যাবে না বিদেশে
হ্যারিবেলাফোন্তের রেকর্ড ছাড়া অন্য কোনো আমদানি,
প্রতিটি পুলিশের জন্য আয়োনেস্কোর নাটক
অবশ্য পাঠ্য হবে,
সেনাবাহিনীর জন্য শিল্পকলার দীর্ঘ ইতিহাস;

রাষ্ট্রপ্রধান কি মেনে নেবেন আমার প্রস্তাবগুলো.
মেনে নেবেন?

বাঙলা ভাষা

হুমায়ুন আজাদ

শেকলে বাঁধা শ্যামল রূপসী, তুমি-আমি, দুর্বিনীত দাসদাসী-
একই শেকলে বাঁধা প'ড়ে আছি শতাব্দীর পর শতাব্দী।
আমাদের ঘিরে শাঁইশাঁই চাবুকের শব্দ, স্তরে স্তরে শেকলের ঝংকার।
তুমি আর আমি সে-গোত্রের যারা চিরদিন উৎপীড়নের মধ্যে গান গায়-
হাহাকার রূপান্তরিত হয় সঙ্গীতে-শোভায়।

লকলকে চাবুকের আক্রোশ আর অজগরের মতো অন্ধ শেকলের
মুখোমুখি আমরা তুলে ধরি আমাদের উদ্ধত দর্পিত সৌন্দর্য:
আদিম ঝরনার মতো অজস্র ধারায় ফিনকি দেয়া টকটকে লাল রক্ত,
চাবুকের থাবায় সূর্যের টুকরোর মতো ছেঁড়া মাংস
আর আকাশের দিকে হাতুড়ির মতো উদ্যত মুষ্টি।

শাঁইশাঁই চাবুকে আমার মিশ্র মাংসপেশি পাথরের চেয়ে শক্ত হয়ে ওঠে
তুমি হয়ে ওঠো তপ্ত কাঞ্চনের চেয়েও সুন্দর।
সভ্যতার সমস্ত শিল্পকলার চেয়ে রহস্যময় তোমার দু-চোখ
যেখানে তাকাও সেখানেই ফুটে ওঠে কুমুদকহ্লার
হরিণের দ্রুত ধাবমান গতির চেয়ে সুন্দর ওই ভ্রুযুগল
তোমার পিঠে চাবুকের দাগ চুনির জড়োয়ার চেয়েও দামি আর রঙিন
তোমার দুই স্তন ঘিরে ঘাতকের কামড়ের দাগ মুক্তোমালার চেয়েও ঝলোমলো
তোমার 'অ, আ'চিৎকার সমস্ত আর্যশ্লোকের চেয়েও পবিত্র অজর

তোমার দীর্ঘশ্বাসের নাম চন্ডীদাস
শতাব্দী কাঁপানো উল্লাসের নাম মধুসূদন
তোমার থরোথরো প্রেমের নাম রবীন্দ্রনাথ
বিজন অশ্রুবিন্দুর নাম জীবনানন্দ
তোমার বিদ্রোহের নাম নজরুল ইসলাম

শাঁইশাঁই চাবুকের আক্রোশে যখন তুমি আর আমি
আকাশের দিকে ছুঁড়ি আমাদের উদ্ধত সুন্দর বাহু, রক্তাক্ত আঙুল,
তখনি সৃষ্টি হয় নাচের নতুন মুদ্রা;
ফিনকি দেয়া লাল রক্ত সমস্ত শরীরে মেখে যখন আমরা গড়িয়ে পড়ি
ধূসর মাটিতে এবং আবার দাঁড়াই পৃথিবীর সমস্ত চাবুকের মুখোমুখি,
তখনি জন্ম নেয় অভাবিত সৌন্দর্যমন্ডিত বিশুদ্ধ নাচ;
এবং যখন শেকলের পর শেকল চুরমার ক'রে ঝনঝন ক'রে বেজে উঠি
আমরা দুজন, তখনি প্রথম জন্মে গভীর-ব্যাপক-শিল্পসম্মত ঐকতান-
আমাদের আদিগন্ত আর্তনাদ বিশশতকের দ্বিতীয়ার্ধের
একমাত্র গান।

স্বার্থপরতা

বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন

তোমরা যে বল 'পরার্থপরতা'
কি অর্থ সে কথাটার?
পরের লাগিয়া আজ বিসর্জন--
বলিদান আপনার।
পরার্থপরতা করে কি পরাণ
দারুণ যাতনাময়?
মহান হৃদয় আত্মবিসর্জনে
সুখী হয় অতিশয়।
তবে কেন বল 'আত্মবিসর্জন'
বল-'সুখ আপনার!'
সকলে কেবল খোঁজে 'আত্মসুখ'
'স্বার্থহীন' কে আবার?
স্বার্থপর হেরি বিশ্ব চরাচর
কে আছে 'পরার্থপর'?
এত ছল কেন? সোজা কথা বল,
'সকলেই স্বার্থপর'।

স্বার্থপরতাই প্রচ্ছন্ন যেখানে
পরার্থ তারেই কয়।
সত্য কথাই বলি, 'পরার্থপরতা'
ও কোন কথাই নয়।
দস্যু অপরের সর্বস্ব লুটিয়া
যথা পুলকিত হবে
দানবীর তথা সর্বস্ব বিলায়ে
পরম আনন্দ লভে।
শুধু বল, রুচি যেমন যাহার
তাঁর সুখ সেই মত।
কোন রোগী জল দেখি' হয় ভীত
কেহ জলে সুখী কত!
খল সুখ হয় চাতুরী কৌশলে
ফিরে সর্বনাশ তরে,
লোক হিতকর চিন্তায় সুজন
স্বর্গসুখ লাভ করে।
পাষন্ড নিঠুর দুর্বালে পীড়িয়া
হয় চরিতার্থ, হায়।
দয়াবীর জন মুছা'ইয়ে পরের
শোকাশ্রু সান্ত্বনা পায়।
গুবরে পোকা যত ভালবাসে শুধু
ঘৃণিত দুর্গন্ধভার।
মধুপ ভ্রমর ভালবাসে ফুল,
ফুলের অমিয় ধারা।
তাই বলি, রুচি যেমন যাহার
সেইরূপ সুখ তার
সবে স্বার্থপর, 'পরার্থপরতা'
কথা শুধু ছলনার!

গৃহত্যাগী জোৎস্না

হুমায়ূন আহমেদ

প্রতি পূর্ণিমার মধ্যরাতে একবার আকাশের দিকে তাকাই
গৃহত্যাগী হবার মত জ্যোৎস্না কি উঠেছে ?
বালিকা ভুলানো জ্যোৎস্না নয়।
যে জ্যোৎস্নায় বালিকারা ছাদের রেলিং ধরে
ছুটাছুটি করতে করতে বলবে-
ও মাগো, কি সুন্দর চাঁদ !
নবদম্পতির জ্যোৎস্নাও নয়।
যে জ্যোৎস্না দেখে স্বামী গাঢ় স্বরে স্ত্রীকে বলবেন-
দেখ দেখ নীতু চাঁদটা তোমার মুখের মতই সুন্দর !
কাজলা দিদির স্যাঁতস্যাতে জ্যোৎস্না নয়।
যে জ্যোৎস্না বাসি স্মৃতিপূর্ণ ডাস্টবিন উল্টে দেয় আকাশে।
কবির জ্যোৎস্না নয়। যে জ্যোৎস্না দেখে কবি বলবেন-
কি আশ্চর্য রূপার থালার মত চাঁদ !
আমি সিদ্ধার্থের মত গৃহত্যাগী জ্যোৎস্নার জন্য বসে আছি।
যে জ্যোৎস্না দেখামাত্র গৃহের সমস্ত দরজা খুলে যাবে-
ঘরের ভেতরে ঢুকে পরবে বিস্তৃত প্রান্তর।
প্রান্তরে হাঁটব, হাঁটব আর হাঁটব-
পূর্ণিমার চাঁদ স্থির হয়ে থাকবে মধ্য আকাশে।
চারদিক থেকে বিবিধ কণ্ঠ ডাকবে- আয় আয় আয়।

ভালোবাসা

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

যাদের আছে টাকা
সবাইকে দিতে তাদের পকেট হল ফাঁকা।

আমার কিছুই নেই
কেমন করে কাউকে কিছু দেই?
শুধু জানি বুকের ভিতর ঠাসা
আছে শুধু সলিড ভালোবাসা।

সেখান থেকে তোমায় দিলাম কিছু
যখন তুমি হেঁটে এলে আমার পিছু পিছু।
পথের পাশে ছোট মেয়েটা বিক্রি করে ফুল
তাকেও কিছু দিতে হল হয়নি কোনো ভুল।

বুকের থেকে ভালোবাসা খাবলা দিয়ে নেই
ছোট ভাইটা দুষ্টু ভারি তাকে কিছু দেই।
মা'কে দিলাম আঁচলখানা ভরে
বাবার জন্য ঢেলে দিলাম রইল যেটুক পড়ে।

ভেবেছিলাম দিয়ে থুয়ে সবই বুঝি যাবে
ভালোবাসা খুঁজলে পরে আর কিছু কই পাবে?
কিন্তু দেখো অবাক ব্যাপার কতো
যত দিচ্ছি কমছে না তো,বাড়তে থাকে তত!

বুকের ভেতর এক্কেবারে ঠাসা
নূতন করে জমা হল সলিড ভালোবাসা।

রাজার উপর রাজা

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

গাছ পুঁতিলাম ফলের আশায়,
পেলাম কেবল কাঁটা।
সুখের আশায় বিবাহ করিলাম
পেলাম কেবল ঝাঁটা ।।
বাসের জন্য ঘর করিলাম
ঘর গেল পুড়ে।
বুড়ো বয়সের জন্য পুঁজি করিলাম
সব গেল উড়ে ।।
চাকুরির জন্যে বিদ্যা করিলাম,
ঘটিল উমেদারি।
যশের জন্য কীর্তি করিলাম,
ঘটিল টিটকারী ।।
সুদের জন্য কর্জ্জ দিলাম,
আসল গেল মারা।
প্রীতির জন্য প্রাণ দিলাম,
শেষে কেঁদে সারা ।।
ধানের জন্য মাঠ চষিলাম,
হলো খড় কুটো ।।
পারের জন্য নৌকা করিলাম,
নৌকা হলো ফুটো ।।
লাভের জন্য ব্যবসা করিলাম,
সব লহনা বাকি।
সেটাম দিয়া আদালত করিলাম,
ডিক্রীর বেলায় ফাঁকি ।।
তবে আর কেন ভাই, বেড়াও ঘুরে,
বেড়ে ভবের হাট।
ঘূর্ণী জলে নৌকা যেমন, ঝড়ের কুটো,
জ্বলন্ত আগুনের কাঠ ।।

মুখে বল হরিনাম ভাই,
হৃদে ভাব হরি!
এ ব্যবসায় লোকসান নেই ভাই,
এসো লাভে ঘর ভরি ।।
এ গুণেতে শত লাভ,
শত গুণে হাজার।
হাজারেতে লক্ষ লাভ,
ভারি ফলাও কারবার ।।
ভাই বল হরি, হরি বোল,
ভাঙ্গ ভবের হাট!
রাজার উপর হওগে রাজা
লাট সাহেবের লাট ।।

ঘাতক তুমি সরে দাঁড়াও
শাহাবুদ্দিন নাগরী

ঘাতক, তুমি সরে দাঁড়াও সামনে থেকে,
এই মাটি এই রক্তস্নাত ভুমি থেকে,
লাল সূর্যের সবুজ জমিন এই পতাকা উড়ছে দেখো
ত্রিশ লক্ষ লাশের ওপর বধ্যভূমি বাংলাদেশে,
দুঃখের নদী সাতরে আসি আগুনঝড়া নয়টি মাসে,
হাতের তালু ঝলসে গেছে তপ্ত ব্যারেল ধরতে গিয়ে,
পায়ের তলায় দগদগে ঘা হাটুর নিচে গুলির ক্ষত,
ঘুমহীন এই চক্ষু আমার ঘুমের কাঙাল,
কাঁধের ওপর লাশের বহর,
ক্লান্তি আমায় আকড়ে আছে,
ঘাতক তুমি সরে দাঁড়াও মগজ আমার বিগড়ে আছে।।
ঘাতক, তোমার চোখে আমি দেখছি আগুন,
ঠোঁটের কোনে হিংস্র হাসি,
নখের ডগায় রক্ত কণা,
একুশ বছর পেরিয়ে গেছে-
তা বলে আর কেউ ভেবো না
স্মৃতি আমার লোপ পেয়েছে,
দিব্যি আমি দেখতে পারি সেই হায়েনা-
মাংসলোভী শকুন হয়ে খামচে আছে বোনের শরীর,
নদী-নালায় ভাসছে হাজার গুলিবিদ্ধ মুক্তিসেনা,
আমার বাবার শেষ আকুতি বাঁচতে চেয়ে,
জায়নামাজে মায়ের মুখে দোয়া-দরুদ আল্লাহ-রসুল,
দিব্যি আমি দেখতে পারি আগুন লাগা গ্রামের সারি
উলটে পড়া ব্রিজ কালভার্ট হত্যা লীলা- ধংসলীলা
ঘাতক, তুমি সামনে আবার দাঁড়িয়ে আছ কোন সাহসে?
সরে দাঁড়াও- নইলে আবার যুদ্ধ হবে এই মাটিতে,
এক হায়েনাও পার পাবে না উপড়ে দেব শিকড় সহ'
শুদ্ধ হবে দেশের মাটি।

তৈরি আমি তৈরি আমি তৈরি আমি।
ঘাতক তুমি সরে দাঁড়াও মিছিল থেকে,
জনসভায় উঠছে দাবি বিচার চেয়ে,
পুত্র হারা মায়ের দাবি
কন্যা হারা বাবার দাবি
বোনহারা এক ভাইয়ের দাবি
উঠছে দেখো মেঘের মতো,
বাদল হয়ে নামবে ওরা
ভাসিয়ে নেবে গ্রাম-জনপদ,
শহর-নগর, বাস্তু ভিটে।
তোমার সাথে আমার থাকা মানায় না আর
ঘাতক, তোমার হৃদয় জুড়ে
কালো শকুন বসত করে
ঘর বেধেছে কালো শেয়াল
সাপের মতো পেচিয়ে আছো বাংলাদেশের সবুজ জমিন,
ফণার ভেতর লুকিয়ে আছে হিংস্র থাবা
বুকের ভেতর বিষের থলি,
চিনতে তোমায় নেই তো বাকি
মধ্যরাতে আবার তুমি নগ্ন হয়ে নামতে পারো,
স্বার্থ বুঝে থামতে পারো,
মেলতে পারো ডানা আবার
এই মাটি এই আকাশ জুড়ে
ঘাতক, তুমি সরে দাঁড়াও লাশ নামাবো কবর খুড়ে।।
তাকিয়ে দেখো- মাটির নিচে
লাশের ওপর লাশের সারি
বৃদ্ধ-যুবক, নর-নারী,
অবুঝ শিশুর আর্তনাদে হাত কাঁপেনি তবু তোমার
ঘাতক, তুমি সরে দাঁড়াও বিগড়ে আছে মগজ আমার।।
একুশ বছর খুব কী সময়?
এইতো সকল দৃশ্যগুলো ছবির মতো ভাসছে চোখে
পচিশে মার্চ একাত্তরে নিশুতি রাতে কাপলো ঢাকা
গড়গড়িয়ে চলল চাকা,
ট্যাঙ্ক কামান আর গুলি গোলায়

নিরস্ত্র সব মানুষগুলো পাখির মতো মরল পথে,
কৃষ্ণচূড়া ফুলের মতো পাপড়িগুলো ঝরল পথে,
ঘাতক, তুমি মাড়িয়ে গেলে মাড়িয়ে গেলে
এমনি ভাবেই দেশটা পুরো
পড়লো চাপা বুটের তলায়
ঘাতক, তোমার ইচ্ছেগুলো পূর্ণ হলো ষোলকলায়।।
এখন আবার কোন সাহসে দাঁড়িয়ে আছ আমার পথে?
মুখে তোমার মুখোশ আটা
চিনতে পারি হর-হামেশাই
এই মাটিতে তোমার পায়ের চিহ্ন দেখে জ্বলছি আমি
এই মাটিতে তোমার কথার বহ্নি দেখে জ্বলছি আমি
এই বাতাসে তোমার কথার প্লাবন দেখে জ্বলছি আমি
এই বাতাসে তোমার জামা দুলছে দেখে জ্বলছি আমি
তবুও তুমি দাঁড়িয়ে আছো?
অস্ত্র আমার জমা দিলেও ট্রেনিং আমি দেইনি জমা
বস্ত্র আমার ছিন্ন হলেও তোমার জন্য নেইতো ক্ষমা।
ঘাতক, তুমি আর থেকো না সামনে আমার,
দাঁড়াও সরে,
প্রতিশোধের নেশার আগুন এখন আমার মাথায় ঘোরে।।
ঘাতক, তুমি সরে দাঁড়াও সামনে থেকে এই সময়ে,
চতুর্দিকে আবার দেখো উঠছে শ্লোগান একাত্তরের
তাকিয়ে দেখো তরুন চোখে মশাল জ্বলে প্রতিবাদের
ভাঙবো আবার দম্ভ তোমার, ভাঙবো আবার স্বপ্ন তোমার,
ভাঙবো তোমার পদযুগল ভাঙবো আবার দুহাত তোমার,
একুশ বছর খুব বেশি নয় আবার আমি দাঁড়িয়ে গেছি
একুশ বছর খুব বেশি নয় দুখের দিবস মাড়িয়ে গেছি,
এখন আবার যুদ্ধ হবে এই মাটিতে তোমার-আমার,
ঘাতক, তুমি পার পাবেনা মানুষগুলো জাগছে আবার,
তাকিয়ে দেখো, তৈরি আমি তাকিয়ে দেখো, তৈরি সবাই ।।

মানুষের সঙ্গে কোনো বিরোধ নেই

ফালগুনী চক্রবর্তী

মানুষের সঙ্গে কোনো বিরোধ নেই
না, মানুষের সঙ্গে আমার আর বিরোধ নেই কোন
এখন পাওনাদার দুর্ঘটনায় পড়লে তাকে নিয়ে যেতে পারি হাসপাতালে
প্রাক্তন প্রেমিকার স্বামীর কাছ থেকে অনায়াসে চাইতে পারি চার্মিনার
দাড়ি গজানোর মতো অনায়াস এ জীবনে আমি
রামকৃষ্ণের কালিপ্রেমে দেখি সার্বভৌম যৌনশান্তি
বাবলিদের স্বামীপ্রেমে দেখি সার্বজনীন যৌনসুখ
একটা চটি হারিয়ে গেলে আমি কিনে ফেলি এক জোড়া নতুন চপ্পল
না, মানুষের সঙ্গে আমার আর বিরোধ নেই কোন
বোনের বুকের থেকে সরে যায় আমার অস্বস্তিময় চোখ
আমি ভাইফোঁটার দিন হেঁটে বেড়াই বেশ্যাপাড়ায়
আমি মরে গেলে দেখতে পাব জন্মান্তরের করিডোর
আমি জন্মাবার আগের মুহূর্তে আমি জানতে পারিনি আমি জন্মাচ্ছি
আমি এক পরিত্রাণহীন নিয়তিলিপ্ত মানুষ
আমি এক নিয়তিহীন সন্ত্রাসলিপ্ত মানুষ
আমি দেখেছি আমার ভিতর এক কুকুর কেঁদে চলে অবিরাম
তার কুকুরীর জন্যে এক সন্ন্যাসী তার সন্ন্যাসিনীর স্বেচ্ছাকৌমার্য
নষ্ট করতে হয়ে ওঠে তৎপর লম্পট আর সেই লাম্পট্যের কাছে
গুঁড়ো হয়ে যায় এমনকী স্বর্গীয় প্রেম শেষ পর্যন্ত আমি
কবিতার ভেতর ছন্দের বদলে জীবনের আনন্দ খোঁজার পক্ষপাতী
তাই জীবনের সঙ্গে আমার কোনো বিরোধ নেই মানুষের সঙ্গে
আমার কোনো বিরোধ নেই

দেন দরবার
শামীম আজাদ

যে ভাবে জীবনকে কামড়ে ধরেছি
তাহার খবর আছে,
এখন ঝেড়ে ফেলে দিলে
ঝামেলা আছে

শুদ্ধ পাথরের পাড়ে
অদৃশ্যের সাথে দ্বিধাদাগ ফেলে
স্বপ্নসামুখে দেহতন্তু কেটে কেটে
পালং শাক আর বরবটি মটরসুঁটি তোলা
এক অথবা দুই দণ্ড দাঁড়িয়ে থাকাইতো ব্যাপক ব্যাপার

সেখানে আমি কিনা প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর
ঘাড় ও হাড়ের কল চেপে চেপে ক্যালসিয়াম আর
অযথা শিল্পকলা নামে আসলে
বেঁচে থাকার অনুপান কিনেছি
দ্বন্দ্বের দানাগুলো করতালি আর
দীর্ঘ সাঁতারে করেছি সিলভার
প্রাচীন প্রবচন পড়ে পড়ে
আরো খামচে ধরেছি তাকে
দাঁড়িয়েছি অদৃশ্যের হাতে হাতে
কাটা কুড়াল আর কিরিচকে
কবুতর অথবা কাছিম বানিয়ে নখ সানিয়েছি
এখন ঝেড়ে দিলে জীবনের গায়ে দাগ রয়ে যাবে
এ আমি অনেকটা নিশ্চিত

জীবনতো বোন অথবা ভাই নয়
সে এক বেপোরোয়া সাথী
আমিও তাহার
আর এখন এ বোঝাপড়া আমার ও তাহার
হয় দাগ নিয়ে বাঁচো
নয় দোহাই তোমার আমিও।

বাংলা ছাড়ো
সিকান্দার আবু জাফর

রক্তচোখের আগুন মেখে ঝলসে-যাওয়া
আমার বছরগুলো
আজকে যখন হাতের মুঠোয়
কণ্ঠনালীর খুন পিয়াসী ছুরি,
কাজ কি তবে আগলে রেখে বুকের কাছে
কেউটে সাপের ঝাঁপি !
আমার হাতেই নিলাম আমার
নির্ভরতার চাবি;
তুমি আমার আকাশ থেকে
সরাও তোমার ছায়া,
তুমি বাংলা ছাড়ো।

অনেক মাপের অনেক জুতোর দামে
তোমার হাতে দিয়েছি ফুল
হৃদয়-সুরভিত
সে-ফুল খুঁজে পায়নি তোমার
চিত্তরসের ছোঁয়া,
পেয়েছে শুধু কঠিন জুতোর তলা।
আজকে যখন তাদের স্মৃতি
অসম্মানের বিষে
তিক্ত প্রাণে শ্বাপদ নখের জ্বালা,
কাজ কি চোখের প্রসন্নতায়
লুকিয়ে রেখে প্রেতের অট্টহাসি !
আমার কাঁধেই নিলাম তুলে
আমার যত বোঝা;
তুমি আমার বাতাস থেকে
মোছো তোমার ধুলো,
তুমি বাংলা ছাড়ো।

একাগ্রতার স্বপ্ন বিনিময়ে
মেঘ চেয়েছি ভিজিয়ে নিতে
যখন পোড়া মাটি
বারেবারেই তোমার খরা
আমার ক্ষেতে বসিয়ে গেছে ঘটি।
আমার প্রীতি তোমার প্রতারণা
যোগ-বিয়োগে মিলিয়ে নিলে
তোমার লোভের জটিল অঙ্কগুলো
আমার কেবল হাড় জুড়ালো
হতাশ্বাসের ধুলো।
আজকে যখন খুঁড়তে গিয়ে
নিজের কবরখানা
আপন খুলির কোদাল দেখি
সর্বনাশা বজ্র দিয়ে গড়া,
কাজ কি দ্বিধায় বিষন্নতায়
বন্দী রেখে ঘৃণার অগ্নিগিরি !
আমার বুকেই ফিরিয়ে নেব
ক্ষিপ্ত বাজের থাবা;
তুমি আমার জলস্থলের
মাদুর থেকে নামো,
তুমি বাংলা ছাড়ো।

একবার পরাজিত হলে

মুহম্মদ নূরুল হুদা

একবার পরাজিত হলে পুনর্বার পরাজিত হব
    এই ভয় থাকে না আমার
জন্মেই মৃত্যুর কোলে রেখেছি শৈশব
কুৎসিত রোগের হাতে বিকিয়েছি
সুন্দরের স্বপ্ন আরাধনা
মায়ের পাণ্ডুর মুখ মিমিষেই দূরান্বয়ী হলে
জন্মসূত্রে উৎসহীন ভেবেছি নিজেকে।

যেদিন গভীর রাতে কুয়াশার আঘাত বাঁচিয়ে
দেখলাম হাটফেরা পিতার শরীর
    বিবর্ণ শরীরে তাঁর
পিতামহী ঝাড়লেন তুকতাক ফুঁক
সেদিন জেনেছি আমি সুফলা মাঠের বুকে
নিশাচর ওত পাতে, ভূত আর জ্বিন শুধু রূপকথা নয়।

কৈশরেই ধ্বসে গেল সমস্ত পৃথিবী, বদলে গেল প্রকৃতির রূপ
ভূমিকম্পে উবে গেলে পিতৃঋণ ভিটে, জলোচ্ছ্বাসে
    মুছে গেলে ভৌগলিক রেখা
নিজেকে বিচ্ছিন্ন বলে অবশ্যই করেছি ঘোষণা;
    যেন কোনো
দুঃশীল কালের জলে সারা দেশ হয়েছে সাগর,
    আমি তার বুকে
নিঃসঙ্গ দ্বীপের নামে টিকে আছি সুপ্রাচীন বঙ্গজনপদ।
সাম্প্রতিক সেই দ্বীপে রাত নামে ভয়ে;
রাত নামে ভয়ে, আর
অস্তমিত সূর্যকণা অকস্মাৎ ক'কাতেই দেখি
বুলেট প্রবিষ্ট এক গেরিলার মুখ,
   জন্মের তোরণে এসে যার সাথে দেখা হয়েছিল

সমুদ্রতরঙ্গ ছিল যার সারা গায়।
পৃষ্ঠদেশে তার
সঙ্গীনের বাঁকা ক্ষত দেখে
নিমিষেই খুলে গেছে সমুখের পথ; সন্ত্রাসের কড়া হাতে
অনিবার্য সেই পথে কারা যেন তুলছে দু হাত;
যেন আমি জেনে গেছি পরিধি আমার
যেন আমি সুনিশ্চিত ভেঙে ফেলব
উদ্বাহু নীল কারাগার।

এক জন্ম

তারাপদ রায়

অনেকদিন দেখা হবে না
তারপর একদিন দেখা হবে।
দুজনেই দুজনকে বলবো,
'অনেকদিন দেখা হয়নি'।

এইভাবে যাবে দিনের পর দিন
বৎসরের পর বৎসর।
তারপর একদিন হয়ত জানা যাবে
বা হয়ত জানা যাবে না,
যে তোমার সঙ্গে আমার
অথবা আমার সঙ্গে তোমার
আর দেখা হবে না।

আমাকে তুমি দাঁড় করিয়ে দিয়েছ বিপ্লবের সামনে

ফরহাদ মাজহার

আমাকে তুমি দাঁড় করিয়ে দিয়েছ ইতিহাসের সামনে
আমার কাঁধে দিয়েছ স্টেনগান, কোমরবন্দে কার্তুজ,
আঙুল ভর্তি ট্রিগার,
বারুদে বিস্ফোরণে উৎকর্ণ আমার শ্রুতি
আমার দৃষ্টিতে ভবিষ্যত
আমি সেই ভবিষ্যতের দিকে নিশানা তাক করে উঠে দাঁড়িয়েছি
আমার গন্তব্য ফুটে উঠেছে প্রতিটি রাস্তায়
প্রতিটি রাজপথে
প্রতিটি আয়ল্যান্ডে
মোড়ে মোড়ে টগবগ করে উঠছে লাল ঝান্ডা
তারা আমাকে ট্রাফিক নির্দেশ দিচ্ছে
আমাকে তুমি দাঁড় করিয়ে দিয়েছ পরিবর্তনের সামনে
এখন আমার আর ফেরার উপায় নেই।

আমার এখন তৈরী হবার সময়-
আমি মিস্ত্রির মতো নিজেকে মেরামত করে নিচ্ছি
র‍্যাঁদায় ঘষে, করাতে কেটে, ধারালো বাটালি দিয়ে আস্তে আস্তে
নিষ্ঠুর অস্ত্রোপচারে খসে যাচ্ছে আমার দোদুল্যমানতা
আমার নড়বড়ে পিছুটানগুলোকে পেরেক মেরে গেঁথে এসেছি পেছনে
পরিত্যক্ত করিডোরে
আমার এখন তৈরী হবার সময়।
আমি মজবুত করে নিচ্ছি আমার নাজুক ইন্দ্রিয়ের গ্রন্থি
নতুন করে বুনে নিচ্ছি আমার স্নায়ুতন্ত্র
আমি জেগে উঠছি নিজের ভেতর থেকে নিজে
আমার মাথায় তুমি পরিয়ে দিয়েছ অভ্যুদয়ের মুকুট
ভবিষ্যত আমাকে অভিবাদন জানাচ্ছে
বড়ো দীর্ঘকাল আমি অপেক্ষা করে ছিলাম

উত্তাল উনসত্তুর আমাকে ডেকে এনেছে রাস্তায়
প্রণয়ীর মতো মাটিকে আলিঙ্গনে বেঁধে রাখে যে চাষা
তার ঔরষে আমার জন্ম
প্রতিটি কৃষক বিদ্রোহে আমি ছিলাম উলঙ্গ শড়কির হিংসা
পলাশীর আম্রকাননে আমি ছিলাম মীরমদনের তলোয়ার
১৮৫৭ র সিপাহী বিদ্রোহী বিদ্রোহের কার্তুজ
আমি ছিলাম তীতুমীরের বাঁশের কেল্লা
ইংরেজের বিরুদ্ধে ওয়াহাবীদের ঘৃণা
একাত্তরে শত্রু "ভুক স্টেনগানের বঙ্কিম ভঙ্গী নিয়ে
ঘুরে বেড়িয়েছি মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে
তরুণ বিপ্লবীর সশস্ত্র তৎপরতা নিয়ে
ছড়িয়ে আছি গ্রামে গ্রামে
শহরে শহরে
বন্দরে বন্দরে
সর্বত্র-

আমার গন্তব্য ফুটে উঠেছে প্রতিটি রাস্তায়
প্রতিটি রাজপথে
প্রতিটি আয়ল্যান্ডে
মোড়ে মোড়ে টগবগ করে উঠছে লাল ঝান্ডা
তারা আমাকে ট্রাফিক নির্দেশ দিচ্ছে
আমাকে তুমি দাঁড় করিয়ে দিয়েছ বিপ্লবের সামনে
এখন আমার আর ফেরার উপায় নেই।

আমার বন্ধু নিরঞ্জন

ভাস্কর চৌধুরী

অনেক কথা বলবার আছে আমার
তবে সবার আগে নিরঞ্জনের কথা বলতে হবে আমাকে
নিরঞ্জন আমার বন্ধুর নাম, আর কোন নাম ছিল কি তার?
আমি জানতাম না।
ওর একজন বান্ধবী ছিল অবশ্য কিছু দিনের জন্য
সে তাকে 'প্রীতম' বলে ডাকত।

ওর বান্ধবীর নাম ছিল জয়লতা
নিরঞ্জন জয়লতা সম্পর্কে আমাকে কিছু বলেনি তেমন।
জয়লতাকে কখনো কোন চিঠি লিখেছিল কিনা
সে কথাও আমাকে সে বলেনি।
তবে জয়লতার চিঠি আমি দেখেছি
একটা চিঠি ছিল এরকম-
প্রীতম,
সময় গড়িয়ে যাচ্ছে। তুমি বলেছ, এখন দুঃসময়-
কিন্তু আমি জানি, সবসময়ই সুসময়, যদি কেউ ব্যবহার করতে জানে তাকে
আমি বুঝি বেশী দিন নেই যদি পার এক্ষুনি তুলে নাও
নইলে অন্য পুরুষ ছিবড়ে খাবে আমাকে-

আমার ঘরে বসে সিগারেট টানতে টানতে
নিরঞ্জন চিঠিটা চুপ করে এগিয়ে দিয়ে বলেছিল, বিভূ, চিঠিটা পড়ুন।

আমি প্রথমে পড়তে চাইনি।
পরে ওইটুকু পড়ে তার দিকে তাকিয়েছিলাম-
না-ওই সিগারেটের ধূঁয়োয়
আমি কোন নারী প্রেম-তাড়িত মানুষের ছায়া দেখিনি- ভয়ানক নির্বিকার।
কিছু বলছেন না যে? আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম
কি বলবো? এই ব্যাপারে।
কোন ব্যাপারে?
এই যে জয়লতা।
বাদ দিন।

আমি বাদ দিয়েছিলাম।
নিরঞ্জন আমার ঘরে বসে অনেকক্ষণ সিগারেট
টেনে টেনে ঘরটাকে অন্ধকার করে চলে গিয়েছিল সেদিন।
জয়লতার সঙ্গে অন্য পুরুষের বিয়ে হয়েছিল
আমি জয়লতা এবং অন্য পুরুষটিকে দেখেছি বহুবার, বিশ্ববিদ্যালয়েই।
জয়লতা আরো দেমাগী
আরো সুন্দরী হয়ে উঠেছিল।
অন্য পুরুষ ছিবড়ে খেলে মেয়েরা বুঝি
আরো সুন্দরী হতে থাকে?

এ কথার সূত্রে সেদিন নিরঞ্জন আমাকে বলেছিল,
মানুষকে এত ক্ষুদ্রার্থে নেবেন না,
মানুষ এত বড় যে,
আপনি যদি 'মানুষ' শব্দটি
একবার উচ্চারণ করেন
যদি অন্তর থেকে করেন উচ্চারণ
যদি বোঝেন এবং উচ্চারণ করেন 'মানুষ'
তো আপনি কাঁদবেন।
আমি মানুষের পক্ষে,
মানুষের সঙ্গে এবং মানুষের জন্যে।

হ্যাঁ, মানুষের মুক্তির জন্য
নিরঞ্জন মিছিল করতো।
আমি শুনেছি নিরঞ্জন বলছে
তুমি দুস্কৃতি মারো, বাঙালি মারো
হিন্দু-মুসলমান মারো, গেরিলা-তামিল মারো
এভাবে যেখানে যাকেই মারো না কেন
ইতিহাস লিখবে যে এত মানুষ মরেছে
বড়ই করুণ এবং বড়ই দুঃখজনক
শক্তির স্বপক্ষে তুমি যারই মৃত্যু উল্লেখ করে
উল্লাস করনা কেন

মনে রেখো মানুষই মরেছে
এই ভয়ঙ্কর সত্য কথা বলে নিরঞ্জন
মিছিলে হাত উঠিয়ে বলেছিল,
এভাবে মানুষ মারা চলবে না।
মানুষকে বাঁচতে দাও।

নিরঞ্জন আমার বন্ধু।
নিরঞ্জন বাঁচেনি।
তার উদ্যত হাতে লেগেছিল
মানুষের হাতে বানানো বন্দুকের গুলি।
বুকেও লেগেছিল- যেখান থেকে 'মানুষ' শব্দটি
বড় পবিত্রতায় বেরিয়ে আসতো।
সে লাশ-
আমার বন্ধু নিরঞ্জনের লাশ,
আমি দেখেছি
রক্তাক্ত ছিন্ন ভিন্ন লাশ,
মানুষ কাঁধে করে
তাকে বয়ে এনেছিল মানুষের কাছে।
জয়লতা সে লাশ দেখেছিল কিনা
সে প্রশ্ন উঠছে না।
দেখলেও যদি কেঁদে থাকে
সে প্রকাশ্যে অথবা গোপনে
তাতে নিরঞ্জনের কোন লাভ হয়নি।
মানুষ কেঁদেছিল
আমি জানি তাতে নিরঞ্জনের লাভ ছিল।
নিরঞ্জন প্রমাণ করতে পেরেছিল
গতকাল মিছিলে
আইন অমান্যের অভিযোগে
যে দুস্কৃতি মারা গিয়েছে
তার নাম নিরঞ্জন-
সে আসলে 'মানুষ'।

শাড়ি

সুবোধ সরকার

বিয়েতে একান্নটা শাড়ি পেয়েছিল মেয়েটা
অষ্টমঙ্গলায় ফিরে এসে আরো ছটা
এতো শাড়ি একসঙ্গে সে জীবনে দেখেনি।

আলমারির প্রথম থাকে সে রাখল সব নীল শাড়িদের
হালকা নীল একটাকে জড়িয়ে ধরে বলল, তুই আমার আকাশ
দ্বিতীয় থাকে রাখল সব গোলাপীদের
একটা গোলাপীকে জড়িয়ে সে বলল, তোর নাম অভিমান
তৃতীয় থাকে তিনটি ময়ূর, যেন তিনদিক থেকে ছুটে আসা সুখ
তেজপাতা রং যে শাড়িটার, তার নাম দিল বিষাদ।
সারা বছর সে শুধু শাড়ি উপহার পেল
এত শাড়ি সে কী করে এক জীবনে পরবে?

কিন্তু বছর যেতে না যেতে ঘটে গেল সেই ঘটনাটা
সন্ধ্যের মুখে মেয়েটি বেরিয়েছিল স্বামীর সঙ্গে, চাইনিজ খেতে
কাপড়ে মুখ বাঁধা তিনটি ছেলে এসে দাঁড়ালো
স্বামীর তলপেটে ঢুকে গেল বারো ইঞ্চি
ওপর থেকে নীচে। নীচে নেমে ডানদিকে,
যাকে বলে এল্।
পড়ে রইল খাবার, চিলি ফিশ থেকে তখনো ধোঁয়া উঠছে।
এর নাম রাজনীতি, বলেছিল পাড়ার লোকেরা।

বিয়েতে একান্নটা শাড়ি পেয়েছিল মেয়েটা
অষ্টমঙ্গলায় ফিরে এসে আরো ছটা
একদিন দুপুরে, শাশুড়ি ঘুমিয়ে, সমস্ত শাড়ি বের করে
ছ'তলার বারান্দা থেকে উড়িয়ে দিল নীচের পৃথিবীতে।
শাশুড়ি পরিয়ে দিয়েছেন তাকে সাদা থান
উনিশ বছরের একটা মেয়ে, সে একা।

কিন্তু সেই থানও এক ঝটকায় খুলে নিল তিনজন, পাড়ার মোড়ে

একটি সদ্য নগ্ন বিধবা মেয়ে দৌড়াচ্ছে আর চিৎকার করছে, বাঁচাও
পেছনে তিনজন, সে কি উল্লাস, নির্বাক পাড়ার লোকেরা।
বিয়েতে একান্নটা শাড়ি পেয়েছিল মেয়েটা
অষ্টমঙ্গলায় ফিরে এসে আরও ছটা।

একুশে ফেব্রুয়ারি
আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী

আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি
ছেলেহারা শত মায়ের অশ্রু-গড়া এ ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি ॥

জাগো নাগিনীরা জাগো নাগিনীরা জাগো কালবোশেখীরা
শিশু হত্যার বিক্ষোভে আজ কাঁপুক বসুন্ধরা,

দেশের সোনার ছেলে খুন করে রোখে মানুষের দাবি
দিন বদলের ক্রান্তি লগনে তবু তোরা পার পাবি?
না, না, না খুন রাঙা ইতিহাসে শেষ রায় দেওয়া তারই
একুশে ফেব্রুয়ারি একুশে ফেব্রুয়ারি ॥

সেদিনো এমনি নীল গগনের বসনে শীতের শেষে
রাত জাগা চাঁদ চুমো খেয়েছিলো হেসে;
পথে পথে ফোটে রজনীগন্ধা অলকানন্দা যেন,
এমন সময় ঝড় এলো এক, ঝড় এলো ক্ষ্যাপা বুনো ॥
সেই আঁধারের পশুদের মুখ চেনা,
তাহাদের তরে মায়ের, বোনের, ভায়ের চরম ঘৃণা
ওরা গুলি ছোঁড়ে এদেশের প্রাণে দেশের দাবিকে রোখে
ওদের ঘৃণ্য পদাঘাত এই বাংলার বুকে
ওরা এদেশের নয়,
দেশের ভাগ্য ওরা করে বিক্রয়
ওরা মানুষের অন্ন, বস্ত্র, শান্তি নিয়েছে কাড়ি
একুশে ফেব্রুয়ারি একুশে ফেব্রুয়ারি ॥
তুমি আজ জাগো তুমি আজ জাগো একুশে ফেব্রুয়ারি
আজো জালিমের কারাগারে মরে বীর ছেলে বীর নারী
আমার শহীদ ভাইয়ের আত্মা ডাকে
জাগে মানুষের সুপ্ত হাটে মাঠে বাঁটে
দারুণ ক্রোধের আগুনে আবার জ্বালাবো ফেব্রুয়ারি
একুশে ফেব্রুয়ারি একুশে ফেব্রুয়ারি

আমি কাঁদতে আসিনি, ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি
মাহবুব-উল আলম চৌধুরী

এখানে যারা প্রাণ দিয়েছে
রমনার ঊর্ধ্বমুখী কৃষ্ণচূড়ার তলায়
যেখানে আগুনের ফুলকির মতো
এখানে ওখানে জ্বলছে অসংখ্য রক্তের ছাপ
সেখানে আমি কাঁদতে আসিনি।
আজ আমি শোকে বিহ্বল নই
আজ আমি ক্রোধে উন্মত্ত নই
আজ আমি প্রতিজ্ঞায় অবিচল
যে শিশু আর কোনোদিন তার
পিতার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ার
সুযোগ পাবে না।

যে গৃহবধূ আর কোনোদিন তার
স্বামীর প্রতীক্ষায় আঁচলে প্রদীপ
ঢেকে দুয়ারে আর দাঁড়িয়ে থাকবে না
যে জননী খোকা এসেছে ব'লে
উদ্দাম আনন্দে সন্তানকে আর
বুকে জড়িয়ে ধরতে পারবে না
যে তরুণ মাটির কোলে লুটিয়ে
পড়ার আগে বারবার একটি
প্রিয়তমার ছবি চোখে আনতে
চেষ্টা করেছিলো;
সে অসংখ্য ভাইবোনদের নামে
আমার হাজার বছরের ঐতিহ্যে লালিত
যে ভাষায় আমি মাকে সম্বোধনে অভ্যস্ত
সেই ভাষা ও স্বদেশের নামে
এখানে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে
আমি তাঁদের ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি।
যারা আমার অসংখ্য ভাইবোনকে
নির্বিচারে হত্যা করেছে।
ওরা চল্লিশজন কিম্বা আরো বেশি

যারা প্রাণ দিয়ে ওখানে রমনার রৌদ্রদগ্ধ
কৃষ্ণচূড়ার গাছের তলায়
ভাষার জন্য মাতৃভাষার জন্য বাংলার জন্য
যারা প্রাণ দিয়েছে ওখানে
একটি দেশের মহান সংস্কৃতির মর্যাদার জন্য
আলাওলের ঐতিহ্য
রবীন্দ্রনাথ, কায়কোবাদ, নজরুলের
সাহিত্য ও কবিতার জন্য।
যারা প্রাণ দিয়েছে
ভাটিয়ালি, বাউল, কীর্তন, গজল
নজরুলের 'খাঁটি সোনার চেয়ে খাঁটি
আমার দেশের মাটি'–
এই দুইটি লাইনের জন্য।
রমনার মাঠের সেই মাটিতে
কৃষ্ণচূড়ার অসংখ্য পাপড়ির মতো
চল্লিশটি তাজা প্রাণ আর
অঙ্কুরিত বীজের খোসার মধ্যে
আমি দেখতে পাচ্ছি তাদের অসংখ্য বুকের রক্ত
রামেশ্বর, আবদুস সালামের কচি বুকের রক্ত
বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে সেরা কোনো
ছেলের বুকের রক্ত।
আমি দেখতে পাচ্ছি তাদের প্রতিটি রক্তকণা
রমনার সবুজ ঘাসের উপর
আগুনের মতো জ্বলছে, জ্বলছে আর জ্বলছে
এক একটি হীরের টুকরোর মতো
বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা ছেলে চল্লিশটি রত্ন
বেঁচে থাকলে যারা হতো
পাকিস্তানের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ;
যাদের মধ্যে লিংকন রঁল্যা
আরাগঁ, আইনস্টাইন আশ্রয় পেয়েছিলো
যাদের মধ্যে আশ্রয় পেয়েছিলো
শতাব্দীর সভ্যতার
সবচেয়ে প্রগতিশীল কয়েকটি মতবাদ
সেই চল্লিশটি রত্ন যেখানে প্রাণ দিয়েছে;
আমরা সেখানে কাঁদতে আসিনি
যারা গুলি ভরতি রাইফেল নিয়ে এসেছিলো ওখানে
যারা এসেছিলো নির্দয়ভাবে হত্যা করার আদেশ নিয়ে
আমরা তাদের কাছে
ভাষার জন্য আবেদন জানাতেও আসিনি আজ;
আমরা এসেছি খুনি জালিমের ফাঁসির দাবি নিয়ে।
আমরা জানি তাদের হত্যা করা হয়েছে
নির্দয়ভাবে তাদের গুলি করা হয়েছে
ওদের কারো নাম তোমারই মতো 'ওসমান'
কারো বাবা তোমারই বাবার মতো
হয়তো কেরানী, কিম্বা পূর্ব বাংলার
নিভৃত কোনো গাঁয়ে কারো বাবা
মাটির বুক থেকে সোনা ফলায়
হয়তো কারো বাবা কোন
সরকারি চাকুরে।
তোমারই আমারই মতো,
যারা হয়তো আজকে বেঁচে থাকতে পারতো
আমারই মতো তাদের কোনো একজনের
হয়তো বিয়ের দিন পর্যন্ত ধার্য হয়েছিলো
তোমারই মতো তাদের কোনো একজনের হয়তো
মায়ের সদ্যপ্রাপ্ত চিঠিখানা এসে পড়বার আশায়
টেবিলে রেখে মিছিলে যোগ দিতে গিয়েছিলো
এমন এক একটি মূর্তিমান স্বপ্নকে বুকে চেপে
জালিমের গুলিতে যারা প্রাণ দিলো;
সেইসব মৃত্যুর নামে
আমি ফাঁসির দাবি করছি।
যারা আমার মাতৃভাষাকে নির্বাসন দিতে
চেয়েছে তাদের জন্য
আমি ফাঁসি দাবি করছি।
যাদের আদেশে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে তাদের জন্য
ফাঁসি দাবি করছি।
যারা এই মৃতদেহের উপর দিয়ে
ক্ষমতার আসনে আরোহণ করেছে
সেই বিশ্বাসঘাতকদের জন্য।
আমি ওদের বিচার দেখতে চাই
খোলা ময়দানে সেই নির্দিষ্ট জায়গাতে
শাস্তিপ্রাপ্তদের গুলিবিদ্ধ অবস্থায়
আমার দেশের মানুষ দেখতে চায়।

পাকিস্তানের প্রথম শহিদ
সেই চল্লিশটি রত্ন
দেশের চল্লিশজন সেরা ছেলে
মা, বাবা, বৌ আর ছেলে নিয়ে
এই পৃথিবীর কোলে এক একটি
সংসার গড়ে তোলা যাদের
স্বপ্ন ছিলো।
যাদের স্বপ্ন ছিলো আইনস্টাইনের বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে
আরো গভীরভাবে বিশ্লেষণ করার
যাদের স্বপ্ন ছিলো আনবিক শক্তিকে
কিভাবে মানুষের কাজে লাগানো যায়
শান্তির কাজে লাগানো যায়
তার সাধনা করার
যাদের স্বপ্ন ছিলো– রবীন্দ্রনাথের
'বাঁশিওয়ালার' চেয়েও সুন্দর
একটি কবিতা রচনা করার।
সেই সব শহীদ ভাইয়েরা আমার
যেখানে তোমরা প্রাণ দিয়েছ
সেখানে হাজার বছর পরেও
সেই মাটি থেকে তোমাদের রক্তাক্ত চিহ্ন
মুছে দিতে পারবে না সভ্যতার কোনো পদক্ষেপ।
যদিও অসংখ্য মিছিল অস্পষ্ট নিস্তব্ধতাকে ভঙ্গ করবে একদিন
তবুও বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই ঘণ্টাধ্বনি
প্রতিদিন তোমাদের ঐতিহাসিক মৃত্যুক্ষণ
ঘোষণা করবে
যদিও আগামীতে কোনো ঝড় ঝঞ্ঝা বিশ্ববিদ্যালয়ের
ভিত্তি পর্যন্ত নাড়িয়ে দিতে পারে
তবুও তোমাদের শহীদ নামের ঔজ্জ্বল্য
কিছুতেই মুছে যাবে না।
খুনী জালিমের নিপীড়নকারীর কঠিন হাত
কোনোদিনও চেপে দিতে পারবে না
তোমাদের সেই লক্ষ দিনের আশাকে
যেদিন আমরা লড়াই করে জিতে নেবো
ন্যায় নীতির দিন।
হে আমার মৃত ভায়েরা
সেই নিস্তব্ধতার মধ্য থেকে
তোমাদের কণ্ঠস্বর
স্বাধীনতার বলিষ্ঠ চিৎকার
ভেসে আসবে,
সেই দিন আমাদের দেশের জনতা
খুনি জালিমকে ফাঁসির কাষ্ঠে
ঝুলাবেই ঝুলাবে
তোমাদের আশা অগ্নিশিখার মতো জ্বলবে
প্রতিশোধ এবং বিজয়ের আনন্দে।

নবীর শিক্ষা

শেখ হাবিবুর রহমান

‘তিন দিন হতে খাইতে না পাই, নাই কিছু মোর ঘরে,
দারা পরিবার বাড়িতে আমার উপোস করিয়া মরে।
নাহি পাই কাজ তাই ত্যাজি লাজ বেড়াই ভিক্ষা করি,
হে দয়াল নবী, দাও কিছু মোরে নহিলে পরানে মরি’।
আরবের নবী, করুণার ছবি ভিখারির পানি চাহি,
কোমল কণ্ঠে কহিলা, ‘তোমার ঘরে কি কিছুই নাহি?’
বলিল সে, ‘আছো শুধু মোর কম্বল একখানি।’
সম্বল আর কম্বলখানি বেচিয়া তাহার করে,
অর্ধেক দাম দিলেন রসুল খাদ্য কেনার তরে,
বাকি টাকা দিয়া কিনিয়া কুঠার, হাতল লাগায়ে নিজে,
কহিলেন, ‘যাও কাঠ কেটে খাও, দেখ খোদা করে কি- যে।’
সেদিন হইতে শ্রম সাধনায় ঢালিল ভিখারি প্রাণ,
বনের কাষ্ঠ বাজারে বেচিয়া দিন করে গুজরান।
অভাব তাহার রহিল না আর, হইল সে সুখী ভবে,
নবীর শিক্ষা ক’রো না ভিক্ষা, মেহনত কর সবে।

আকাশ আমার ঘরের ছাউনী

সাবির আহমেদ চৌধুরী

আকাশ আমার ঘরের ছাউনী
পৃথিবী আমার ঘর
সারা দুনিয়ার সকল মানুষ
কেউ নয় মোর পর॥

করি না বিচার জাতি ধর্মের
কোন ভেদাভেদ ভাষা বর্ণের
সবাই মানুষ এই পরিচয়
হৃদয়ে নিরন্তর॥

মানব সমাজে আমি যে এক
অংশ মানবতার
আমাতে রয়েছে সকলের তরে
দয়া মায়া স্রষ্টার।

আর্ত নিঃস্ব ব্যথিদের ব্যথা
জাগায় মরমে সদা ব্যাকুলতা
অপরের সুখে সুখ পাই আমি
দুখে কাঁদে অন্তর॥

মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে

শঙ্খ ঘোষ

একলা হয়ে দাঁড়িয়ে আছি
তোমার জন্যে গলির কোণে
ভাবি আমার মুখ দেখাব
মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে।

একটা দুটো সহজ কথা
বলব ভাবি চোখের আড়ে
জৌলুশে তা ঝলসে ওঠে
বিজ্ঞাপনে, রংবাহারে।

কে কাকে ঠিক কেমন দেখে
বুঝতে পারা শক্ত খুবই
হা রে আমার বাড়িয়ে বলা
হা রে আমার জন্ম ভূমি।

বিকিয়ে গেছে চোখের চাওয়া
তোমার সাথে ওতপ্রত
নিয়ন আলোয় পণ্য হলো
যা কিছু আজ ব্যক্তিগত।

মুখের কথা একলা হয়ে
রইলো পড়ে গলির কোণে
ক্লান্ত আমার মুখোশ শুধু
ঝুলতে থাকে বিজ্ঞাপনে।

বঙ্গভাষা

-মাইকেল মধুসূদন দত্ত

হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন;--
তা সবে, (অবোধ আমি!) অবহেলা করি,
পর-ধন-লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।
কাটাইনু বহু দিন সুখ পরিহরি!
অনিদ্রায়, অনাহারে সঁপি কায়, মনঃ,
মজিনু বিফল তপে অবরেণ্যে বরি;--
কেলিনু শৈবালে, ভুলি কমল-কানন!

স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী কয়ে দিলা পরে, --
"ওরে বাছা, মাতৃকোষে রতনের রাজি,
এ ভিখারী-দশা তবে কেন তোর আজি?
যা ফিরি, অজ্ঞান তুই, যারে ফিরি ঘরে।"
পালিলাম আজ্ঞা সুখে' পাইলাম কালে
মাতৃভাষা-রূপ খনি, পূর্ণ মণিজালে।।

শোন একটি মুজিবরের থেকে
গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার

শোন একটি মুজিবরের থেকে
লক্ষ মুজিবরের কণ্ঠস্বরের ধ্বনি-প্রতিধ্বনি
আকাশে বাতাসে ওঠে রণি
বাংলাদেশ, আমার বাংলাদেশ।

সেই সবুজের বুক চেরা মেঠোপথে
আবার যে যাব ফিরে, আমার
হারানো বাংলাকে আবার তো ফিরে পাব
শিল্পে-কাব্যে কোথায় আছে
হায়রে এমন সোনার খনি।

বিশ্বকবির 'সোনার বাংলা'
নজরুলের 'বাংলাদেশ'
জীবনানন্দের 'রূপসী বাংলা'
রূপের যে তার নেই কো শেষ, বাংলাদেশ।

'জয় বাংলা' বলতে মনরে আমার
এখনো কেন ভাব, আমার
হারানো বাংলাকে আবার তো ফিরে পাব
অন্ধকারে পুব আকাশে
উঠবে আবার দিনমণি।

এলোমেলো তুমি
রোকেয়া বেগম রুকু

রক্তাক্ত হৃদয় থেকে আমি তোমার হাতে তুলে দিতে পারি
একগুচ্ছ গোলাপের বিশুদ্ধ সৌরভ,
আমি তোমার জন্যে গড়ে দিতে পারি।
শূন্যতায় ভাসমান অগণিত বেলুনের বিপুল উৎসব,
আদিগন্ত ফসলের সম্ভাবনা এনে দিতে পারি আমি শ্রম সাধনায়
সজীব বাগান আর বাথানে দুধেল গাই
ফলদ বৃক্ষের ছায়া, সুশীতল জনপদ।
রূপালি মাছের নদী, সাঁতার কাটা এক ঝাঁক হাঁস
কেবল তোমার জন্যে রয়েছে আমার প্রতীক্ষায়
দায়বদ্ধ হতে না হতেই তুমি গেলে দূরে চলে।
প্রেমের বন্ধন কিছু ছিল না বলেই বুঝি দায়মুক্ত হলে।
রঙিন মলাট দেখে বই কিনেছিল এক যুবক।
তার রঙিন স্বপ্নের কিছু প্রতিভা ছিল না সেখানে
রঙিন ছাপার শাড়ি শখ করে কিনেছিল এক যুবতী
দু'দিনেই সে শাড়ির রং উঠে গেল।
অথচ গোলাপ তার সৌরভের কোন রং তুলিতে আঁকেনি
পাখ পাখালীর গানে প্রত্যুষে নিবিড় মমতা।
হৃদয়ে ছড়ায় রং বর্ণের অতীত সেই রং।
প্রশান্তির আলো ছায়ায় চোখে মুখে মেখে দেয় অলৌকিক শক্তির দুহাতে।
রক্তাক্ত হৃদয় থেকে অলৌকিক মহিমায় তুলে দেবো।
এক গুচ্ছ গোলাপের ঘ্রাণ।
স্মৃতির সৌরভ মেখে সোনালি রোদ্দুর এসে
তখনি ছুঁয়ে যাবে তোমার বাগান।
তখনি ছুঁয়ে যাবে পুষ্টতায় পরিপূর্ণ তোমার শরীর?
যে শরীর অকৃপণ অনুদান সহজ সরল প্রকৃতির।

জন্ম জন্মান্তর

রুমা মোদক

তুমি খুব সুন্দর
অতপর সে হাত পাতে প্রথম আবেগের জন্য...
আমি তোমাকে ভালোবাসি
অতপর সে নত হয় প্রথম স্পর্শের জন্য
মেয়ে এর একটাও তার কথা নয়
তোমার কণ্ঠ তো খুব মিষ্টি
জেনে বর্তে যাও তুমি
পায়েস খুব ভালো রাঁধো তুমি
জেনে ধন্য হয়ে যায় জন্ম তোমার
বোকা মেয়ে, এর একটাও তার কথা উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া,
জৈবিকতা আর সভ্যতার দোহাই
অথচ কুমকুম চন্দনের জন্য
মেদহীন নিতম্বের জন্য সপ্তস্বরের জন্য
কালোগাই দুধের জন্য প্রতিটি জন্মে নিজেকে নিংড়ে দাও তুমি

আগমনী

প্রেমেন্দ্র মিত্র

বর্ষা করে যাব, যাব,
শীত এখনও দূর,
এরই মধ্যে মিঠে কিন্তু
হয়েছে রোদ্দুর!

মেঘগুলো সব দরে আকাশে
পারছে না ঠিক বুঝতে,
ঝরবে, নাকি যাবে উড়ে
অন্য কোথাও খুঁজতে!

থেকে থেকে তাই কি শুনি
বুক-কাপানো ডাক?
হাঁকটা যতই হোক না জবর
মধ্যে ফাঁকির ফাক!

আকাশ বাতাস আনমনা আজ
শুনে এ কোন ধ্বনি,
চিরনতুন হয়েও অচিন
এ কার আগমনী।

ভাত দে হারামজাদা

রফিক আজাদ

ভীষণ ক্ষুধার্ত আছি উদরে, শরীরবৃত্ত ব্যেপে
অনুভূত হতে থাকে- প্রতিপলে- সর্বগ্রাসী ক্ষুধা
অনাবৃষ্টি- যেমন চৈত্রের শষ্যক্ষেত্রে- জ্বেলে দ্যায়
প্রভূত দাহন- তেমনি ক্ষুধার জ্বালা, জ্বলে দেহ
দু'বেলা দু'মুঠো পেলে মোটে নেই অন্য কোন দাবী
অনেকে অনেক কিছু চেয়ে নিচ্ছে, সকলেই চায়
বাড়ি, গাড়ি, টাকা কড়ি- কারো বা খ্যাতির লোভ আছে
আমার সামান্য দাবী পুড়ে যাচ্ছে পেটের প্রান্তর-
ভাত চাই- এই চাওয়া সরাসরি- ঠান্ডা বা গরম
সরু বা দারুণ মোটা রেশনের লাল চাল হ'লে
কোনো ক্ষতি নেই- মাটির শানকি ভর্তি ভাত চাই
দু'বেলা দু'মুঠো পেলে ছেড়ে দেবো অন্য-সব দাবী;
অযৌক্তিক লোভ নেই, এমনকি নেই যৌন ক্ষুধা
চাইনিতো নাভি নিম্নে পরা শাড়ি, শাড়ির মালিক;
যে চায় সে নিয়ে যাক- যাকে ইচ্ছা তাকে দিয়ে দাও
জেনে রাখো আমার ও সবের কোনো পয়োজন নেই।

যদি না মেটাতে পারো আমার সামান্য এই দাবী
তোমার সমস্ত রাজ্যে দক্ষযজ্ঞ কাণ্ড ঘ'টে যাবে
ক্ষুধার্তের কাছে নেই ইষ্টানিষ্ট, আইন কানুন-
সম্মুখে যা কিছু পাবো খেয়ে যাবো অবলীলাক্রমে
থাকবে না কিছু বাকি- চলে যাবে হা ভাতের গ্রাসে।
যদি বা দৈবাৎ সম্মুখে তোমাকে ধরো পেয়ে যাই-
রাক্ষুসে ক্ষুধার কাছে উপাদেয় উপাচার হবে।
সর্বপরিবেশগ্রাসী হ'লে সামান্য ভাতের ক্ষুধা
ভয়াবহ পরিণতি নিয়ে আসে নিমন্ত্রণ করে।

দৃশ্য থেকে দ্রষ্টা অব্দি ধারাবাহিকতা খেয়ে ফেলে
অবশেষে যথাক্রমে খাবো : গাছপালা, নদী-নালা
গ্রাম-গঞ্জ, ফুটপাত, নর্দমার জলের প্রপাত
চলাচলকারী পথচারী, নিতম্ব প্রধান নারী
উড্ডীন পতাকাসহ খাদ্যমন্ত্রী ও মন্ত্রীর গাড়ি
আমার ক্ষুধার কাছে কিছুই ফেলনা নয় আজ
ভাত দে হারামজাদা,
তা না হলে মানচিত্র খাবো

বাণী

সহস্র বছরে বাংলা সাহিত্যে নান্দনিক সৌন্দর্য বহন করে চলছে কবিতা।
কবিতা হচ্ছে শাশ্বত সত্য ও সুন্দরের ধারক ও বাহক। শতাব্দীর সেরা কবিতায় গ্রন্থের সম্পাদক রোকেয়া বেগম রুকু বাছাইকরা কবিতা উপস্থাপন করেছেন। যা আবৃত্তি শিল্পীদের নিকট সহায়ক গ্রন্থ হিসেবে সাদরে গৃহিত হবে। নোবেল বিজয়ী কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে বর্তমান সময়ের সেরা কবিদের কবিতা এই গ্রন্থটিকে সমৃদ্ধ করেছে। কবিতা প্রেমিদের নিকট গ্রন্থটি সুখপাঠ্য হোক, পাঠক মহলে কবিতা আরো জনপ্রিয় হয়ে উঠুক সেই ভাবনা থেকে রোকেয়া বেগম রুকুর এই প্রচেষ্টা। তার প্রচেষ্টার ফসল বাংলা সাহিত্য ভান্ডারকে আরো সমৃদ্ধ করুক। গ্রন্থটির সাফল্য কামনায়-

খন্দকার গোলাম ফারুক
কমিশনার
ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি)

জোছনার আহবান

শামীম আরা

রাত গভীর থেকে গভীর হচ্ছে
চাঁদ তার জোছনা নিয়ে
অসুস্থ পৃথিবীতে হাঁটছে
চারদিকে থৈথৈ আলো
আমি আলো ধরতে চাইলাম,
সাগরের উত্তাল ঢেউ
আমার পায়ে এসে নাচানাচি করছে
পায়ের নূপুরের রিনিঝিনি কী দুর্বোধ্য
আমায় টেনে নিয়ে যায় ঘরের অন্ধকারে
দু'চারটে পাখিদের কিচিরমিচির
হাতছানি দিয়ে আমায় ডাকে
গাছের পাতারা সোনালি আভায় কী অপূর্ব
আমি আমার বদ্ধ জানালায় উঁকি দিয়ে দেখি
ভোর হতে দেরি নেই
মরীচিকার মায়ায় জোছনার সাথে তবুও হাঁটতে চাই
কিন্তু ওরা দেবে না
জানালার গ্রিলে আটকে গেছে বিষাক্ত জীবাণুর আলিঙ্গন
ইউক্রেনের যুদ্ধ
ঘরের কোণায় কোণায় বিষধর সাপ ফোঁস করে আছে
রক্ত চক্ষু দেখায়
ওদেরকে সামলাতে সামলাতে
সুযোগ পেলেই জানালায় দাঁড়াই
একটি ভোর চাই
সুস্থ পৃথিবী চাই
যেখানে জোছনারা নরম মখমল আলো দিবে
সূর্যের তাপে তাপে এখনো পুড়ছি আমি
তেমনি আলোর জন্যে।

বঙ্গবন্ধুর তর্জনী

নাহিদ হোসনা

যদি ভাবি বাহান্নের কথা
যদি ভাবি মহান একাত্তরের কথা
গভীর শ্রদ্ধা তীব্র যন্ত্রণায় ভরে ওঠে বুক,
দেহের ভেতর রক্ত শিরা-ধমনী অস্থির হয়
বোবা মন গুমরে গুমরে মরে ব্যথায় ।
সন্তান হারানোর কী জ্বালা!
বোনের লজ্জায় কী আঘাত!
বাবার জায়নামাজের কী বিলাপ!
অদ্ভুত সেই অনুভূতি, অদ্ভুত সেই যন্ত্রণা,
যা কুড়ে কুড়ে আজও আমার মন
জ্বলন্ত বারুদের মতো জ্বলতে থাকে।
অধীর অপেক্ষায় ছিলাম
হয়তো কেউ আসবে
ফুল চন্দন ছোঁয়াতে, আলোর মশাল নিয়ে।
হয়তো কেউ আসবে
উত্তপ্ত জ্বলন্ত লাভা হয়ে
যার আঁচে যার উষ্ণতায়
জ্বলে পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যাবে।
কবে আসবে সেই মহানায়ক,
কবে আসবে সেই মহাপুরুষ,
যে সাতকোটি মানুষের জন্য
নিজের বুকের টগবগে ফুটে উঠা
দেহের প্রবহমান রক্ত বিলিয়ে দিবে।
যে রক্ত দাবি করে দেশের সাতকোটি মানুষের অধিকার,
যে রক্ত প্রমাণ করে মানুষের মূল্যবোধ,
যে রক্ত জাগিয়ে তোলে মানুষের মনুষ্যত্ব,
যে রক্ত বলিদান দেয় মানুষের আত্মত্যাগ ।
অবশেষে জনমঞ্চে এসে হাজির হলেন
মহান নেতা, মহান পুরুষ ।
যার বুকের ভেতর টগবগে ফুটে ওঠা প্রতিটি শব্দ
বন্দুকের বারুদের মতো বর্ষণ হতে থাকে।
যার তর্জনীতে জনসমুদ্রে ফিরে পেল বাহুবল,

যার বলিষ্ঠ কণ্ঠে গর্জে উঠেছিল জনমঞ্চ।
যার আত্মবিশ্বাসে সূর্য নতুন করে তেজ খুঁজে পেল।
আকাশে বাতাসে আজও ধ্বনিত হতে থাকে স্বাধীনতা শব্দটি।
যার জন্য অপেক্ষা করেছিল দেশের সাতকোটি মানুষ
যার তর্জনীতে উড়ন্ত পতাকার পতপত শব্দ ধ্বনিত হতে থাকে
"রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরও দেব
এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ্।"
যার তর্জনীতে মুক্তি পায়
স্বাধীন বাংলার স্বাধীন মাটি।
যার তর্জনীই আমার বাংলাদেশ,
আমার স্বাধীন সোনার বাংলাদেশ।
জয় বাংলা।

হৃদয়ে মোর বঙ্গবন্ধু

ডা. রতন চন্দ্র সাহা

ঘুমিয়ে আছো পিতা
নীরবে নিথরে,
জেগে আছে তোমার
লক্ষ সৈনিক প্রহরে প্রহরে।
সদা জাগ্রত
অবিনশ্বর তব প্রাণ,
সহস্র কোটি জনতা
গাহিছে তোমারই জয়গান।
রক্তে মোর বঙ্গবন্ধু
শিরা-উপশিরায়
কেবলই তোমার আদর্শের
জয়গান গায়।
হৃদয় চিরে যদি দেখাতে পারতাম
যেমন বীর হনুমান,
ভগবানের পরে হৃদয়ে
রয়েছে তোমারই স্থান।
অটুট অমর তুমি
পিতা বিদ্যাচলসম
হৃদয় প্রকোষ্ঠে প্রতিটি
কোণায় রয়েছো মম।
বীর চূড়ামণি, মহাবীর,
তুমিই সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি
জনতার মুক্তির কারণে
নিজেকে দিয়েছো বলি।
৭ মার্চ '৭১ সাল বজ্রকণ্ঠে,
বজ্রনিনাদে বজ্র আদেশ–
সমস্ত মুক্তিযুদ্ধ চলে নয় মাস
জাতি ধর্ম নির্বিশেষ।

জন্মভূমি
ইসমাইল হোসেন সিরাজী

হউক সে মহাজ্ঞানী মহা ধনবান,
অসীম ক্ষমতা তার অতুল সম্মান,
হউক বিভব তার সম সিন্ধু জল
হউক প্রতিভা তার অক্ষুণ্ন উজ্জ্বল
হউক তাহার বাস রম্য হর্ম্য মাঝে
থাকুক সে মণিময় মহামূল্য সাজে
হউক তাহার রূপ চন্দ্রের উপম
হউক বীরেন্দ্র সেই যেন সে রোস্তম
শত শত দাস তার সেবুক চরণ
করুক স্তাবক দল স্তব সংকীর্তন।

কিন্তু যে সাধেনি কভু জন্মভূমি হিত
স্বজাতির সেবা যেবা করেনি কিঞ্চিৎ
জানাও সে নরাধমে জানাও সত্বর,
অতীব ঘৃণিত সেই পাষণ্ড বর্বর।

সাহস ও ধৈর্য
মাহমুদ কামাল

সাহস ধৈর্যকে পরাজিত করে...

ধৈর্যের চেয়ে কি সাহসের বেশি প্রয়োজন?
নাকি সাহসের চেয়ে ধৈর্য!
এই প্রশ্নের সমাধান খুঁজতে গিয়ে
কখনো সাহস হারিয়ে ফেলি
কখনো ধৈর্য।

২৬.১১.২০২০

গোপনেরও সৌন্দর্য আছে
মাহমুদ কামাল

গোপন প্রকাশ্য হলে
আলোকের দ্যুতি কমে যায়
গোপনের ঘরে গোপনকেই
রেখে দেয়া ভালো
গোপনেরও সৌন্দর্য আছে
শিল্পের সকল সংজ্ঞা
শুধুমাত্র প্রকাশে মেলে না
অপ্রকাশও জীবনের সৌন্দর্য প্রতীক।

২৬.১২.২০২০